কবির গদ্য

রমানাথ ভট্টাচার্য

পাঠক

৩৬ এ কলেজ রো কলকাতা ৭০০ ০০৯

KOBIR GODYA
Poets Prose
by
RAMANATH BHATTACHARYA

প্রথম প্রকাশ
কলকাতা বইমেলা। জানুয়ারি ২০১৭

গ্রন্থস্বত্ব
শ্রী শ্যামাশিস ভট্টাচার্য

প্রকাশক
পাঠক। ৩৬এ কলেজ রো কলকাতা ৭০০ ০০৯

বর্ণসংস্থাপক
অক্ষরবৃত্ত। কলকাতা ৭০০ ০৩৬

মুদ্রক
এস. এস. প্রিন্ট। কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
দেবাশিস সাহা

১৫০ টাকা

স্ত্রী রিক্তা, পুত্র শ্যামাশিস
পুত্রবধূ নীলিমা
এবং
পৌত্রী গৌরী সোনা
পরম আত্মজনেষু

আমার এ গদ্যটির নাম 'কবির গদ্য'। গ্রন্থটির নামকরণ করেছেন সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়। স্নেহাস্পদ সুধাংশুশেখর ছাড়াও কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়, কবি-প্রাবন্ধিক শুভেন্দু বারিক, অধ্যাপক পার্থ শর্মা এবং গুয়াহাটি থেকে প্রকাশিত মাসিক 'ব্যতিক্রম' পত্রিকার সম্পাদক সৌমেন ভারতীয়ারও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে আমার রচিত গদ্য। শুভেন্দু বারিক মহাশয় তো আমার গদ্য নিয়ে 'কবির গদ্য রচনা'— নামে একটি নিবন্ধই লিখে ফেলেছেন। মূলত তাঁদের কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই আমি এ গ্রন্থটি প্রকাশ করছি। ১৯৭০ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত লেখা আমার যে সব গদ্য এখনো গ্রন্থভূক্ত হয়নি মুখ্যত সে-সব রচনার সংগ্রহ এ গ্রন্থটি। পরিশেষে বলি, গ্রন্থভূক্ত এ লেখাগুলিতে প্রধানত কবিতা সংক্রান্ত আমার ধ্যানধারণাই প্রকাশ পেয়েছে।

অনুজপ্রতিম কবি শ্যামলকান্তি দাশ এই গ্রন্থটির ভূমিকাও লিখে দিয়েছেন। প্রিয় বন্ধু পবিত্রবাবু, শুভেন্দুবাবু, পার্থ শর্মা ও সৌমেন ভারতীয়াকে সাধুবাদ জানাই। গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকরণে সাহায্য করেছেন মুম্বই স্থিত শকুন্তলম টেলিফিল্‌মে কর্মরত শ্রীমান দিলীপ মান্না। এ সুযোগ তাঁকেও সাধুবাদ জানাই। পাঠকের অন্যতম কর্ণধার কবি শংকর চক্রবর্তী ও প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য সুধীজনকেও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

রমানাথ ভট্টাচার্য
ডি-১০৬, পাম কোর্ট
মালাড ওয়েস্ট
মুম্বাই ৪০০ ০৬৪
১৬.০৯.২০১৪

কিছু কথা

কবিতার বিচিত্র পথে এক অক্লান্ত পথিক কবি রমানাথ ভট্টাচার্য। কমবেশি পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি কবিতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছেন। কেবলমাত্র কবিতা লিখেই তিনি ক্ষান্ত থাকেননি, কবিতার পাশাপাশি লিখেছেন নানা স্বাদ ও বর্ণের অজস্র গদ্য রচনা। অনুবাদ করেছেন অসমিয়া কবিতা, ছাড়াও অনেক বিদেশি কবিতা। 'আধুনিক অসমীয়া কবিতা' এবং 'পড়োশি গোলাপ' নামে তাঁর দুটি মূল্যবান অনুবাদ-গ্রন্থও আছে। সত্তর দশকের গোড়ার দিকে সম্পাদনা করেছেন একটি বিশিষ্ট কবিতানির্ভর পত্রিকা 'ঋতুরঙ্গ'।

বাংলা কবিতার মূল স্রোত থেকে অনেক দূরে থেকেও এই মরমি ও মুক্ত মনের মানুষটি কখনও কবিতা-বিচ্ছিন্ন হননি। জীবনের নানা দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্যেও রমানাথ প্রতিনিয়ত কবিতার রূপ, রীতি ও রূপান্তর নিয়ে ভেবেছেন, কবিতার পঠনপাঠনে নিরলসভাবে ব্যাপৃত থেকেছেন, এবং, বলা বাহুল্য, এ-বিষয়ে স্বাধীন মত প্রকাশ করে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। যশস্বী কবি রমানাথ ভট্টাচার্যের জীবনব্যাপী কাব্যসাধনার আর একটি উজ্জ্বল ও গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, কয়েক বছর ধরে তিনি বাংলা ও অসমিয়া কবিতার প্রচার ও প্রসারে মহত্তম ভূমিকা নিয়েছেন। প্রতি বছর এই দুটি ভাষার বিশিষ্ট কবিদের নানাভাবে সম্মানিত করছেন। কাব্যজগতে এ এক বিরল নিদর্শন।

'কবির গদ্য' রমানাথ ভট্টাচার্যের লেখা একটি গদ্যের সংকলন। ১৯৭০ সাল থেকে ২০১৪—এই সময়খণ্ডে লেখা ৩০টি গদ্য আলোচ্য সংকলনটিতে গ্রথিত হয়েছে। প্রতিটি গদ্যেই লেখকের জাগ্রত কবিমনের স্ফূর্ত প্রকাশ। কবিতা সম্পর্কিত তাঁর ধ্যানধারণা ও উপলব্ধির কথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। বেশিরভাগ গদ্যই আয়তনে ছোটো— মিতায়তন। অকারণে দীর্ঘ বা পল্লবিত করেননি। ছোটো হলেও ভাবনার স্বচ্ছতায়, বলবার গুণে, প্রকাশের দক্ষতায়, ভাষার সৌকর্যে প্রতিটি রচনাই হয়ে উঠেছে সংযত, সংহত ও অনিবার্য। একটি রচনাও আলগা বা শিথিল নয়। এই বইয়ের দীর্ঘ রচনাটির নাম, 'আড়ালের আমি'। কবি রমানাথ এই গদ্যরচনায় তাঁর বহু অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ জীবন ও জীবনচর্যার নানা দিক উন্মোচন করেছেন অননুকরণীয় ভাষায়। কোথাও কোনো আড়াল রাখেননি। যা সত্য, যা সুন্দর, যা অমোঘ, যে মৌল

ধর্ম আমাদের জীবনকে ব্যঞ্জিত করে—তা তিনি স্বচ্ছন্দে জানিয়েছেন। তাঁর রচনার প্রসন্ন প্রসাদগুণ আমাদের তৃপ্ত করে। উল্লিখিত রচনাটিতে কবি ও গদ্যশিল্পী রমানাথ বলছেন, 'আমি মূলত রোমান্টিক কবি। আমার কবিতায় প্রেমের আধারে প্রস্ফুট সৌন্দর্য চেতনা। মৃত্যুচেতনা, জীবনরহস্য, প্রকৃতি, সমাজ বাস্তবতা ও ঐশী চেতনাও আমার কবিতার অন্যতম বিষয়।' এই রচনারই অন্যত্র তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি, 'নারী আমার কাছে শুধু সৌন্দর্য-মাধুর্যের প্রতিমূর্তি নয়—তারও আছে বহু অমানুষিক গুণ—এসব অপগুণী দোষত্রুটি নিয়েও আমি কল্পনার সহায়তায় রচনা করি কবিতা...। আমার প্রেমের ভুবনে বৈধ অবৈধ একাকার।'

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। 'কবির গদ্য' বইয়ের প্রায় প্রতিটি গদ্যরচনাই স্বাদু, স্নিগ্ধ, চিন্তার আলোয় উদ্ভাসিত। জীবননিষ্ঠ লেখকের প্রখর বিচারবোধে অসামান্য। 'ধানসিড়ি বেয়ে বেয়ে', 'কবিতা সম্পর্কে কিছু ভাবনা চিন্তা', 'সাহিত্য ও আঞ্চলিকতা', 'ভূমিকা— আধুনিক অসমীয়া কবিতা', 'নীলমণি ফুকনের কবিতা', 'প্রসঙ্গ : অনুবাদ', 'কবিতা কল্পলতা', 'শতবর্ষে বিষ্ণু দে', 'আমার চোখে রবীন্দ্রনাথ', 'কবীশ পবিত্র মুখোপাধ্যায়', 'স্বামী চণ্ডিকানন্দ মহারাজ', 'ব্যক্তি পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ সম্পর্কে দু'চার কথা', 'কাব্যে আধুনিকতা'—গ্রন্থভুক্ত এই রচনাগুলি পাঠককে অনুসন্ধিৎসু করবে, ঋদ্ধ করবে। কবিতার পাঠক মাত্রেই এই আশ্চর্য গদ্যরচনাগুলি থেকে যে প্রভূত চিন্তার খোরাক পাবেন—একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

তাঁর কবিতার মতোই সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ভাষায় রচিত কবি রমানাথের গদ্য রচনাবলি। আমার বিশ্বাস, নিজস্ব ঔজ্জ্বল্যে দীপ্ত এই বইটি মনস্ক পাঠকের যথাযথ শ্রদ্ধা ও সমীহ আদায় করে নেবে।

শ্যামলকান্তি দাশ

সূচি

প্রাসঙ্গিক ১৩
ধানসিড়ি বেয়ে বেয়ে... ১৫
ঋতুরঙ্গ ৩/২০
কবিতা সম্পর্কে কিছু ভাবনা চিন্তা ২১
সাহিত্য ও আঞ্চলিকতা ২৫
ভূমিকা—আধুনিক অসমীয়া কবিতা ২৮
অনুবাদ প্রসঙ্গে ৩৭
গ্রন্থ প্রকাশ উপলক্ষে গ্রন্থকারের দু'চার কথা ৪১
অগ্রজ প্রতিম নীলমণি ৪৪
অগ্রজ প্রতিমের প্রয়াণে ৫১
কেন লিখি ৫৪
নীলমণি ফুকনের কবিতা ৫৬
প্রসঙ্গ : অনুবাদ ৬৫
পোয়েটস ফাউন্ডেশন এওয়ার্ড প্রাপ্ত কবির ভাষণ ৬৭
প্রসঙ্গ : কবিতা ৬৮
কবিতা নানান রকম ৭১
কবিতা কল্পলতা ৭২

শতবর্ষে বিষ্ণু দে ৭৪
আমার চোখে রবীন্দ্রনাথ ৭৮
কবিতা, কল্পনালতা ৮১
আড়ালের আমি ৮৭
প্রবন্ধকার শুভেন্দু বারিক ৯৮
ব্যতিক্রম গোষ্ঠীর সম্মাননা অনুষ্ঠানে ভাষণ ১০১
জীবনানন্দ সভাঘরে সংবর্ধনাকালে ভাষণ ১০২
কবীশ পবিত্র মুখোপাধ্যায় ১০৩
স্বামী চণ্ডিকানন্দ মহারাজ ১০৫
ব্যক্তি পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ সম্পর্কে দু'চার কথা ১১২
কাব্যে আধুনিকতা ১১৫
মুম্বাইস্থিত মৈত্রী কালচারেল এসোসিয়েশনের
প্রথম দুর্গোৎসব, ২০১৪ ১১৮

প্রাসঙ্গিক

এক

'শিলঙের কবিতা'র দ্বিতীয় বর্ষ, হৈমন্তী সংখ্যা, ১ম সংকলন আত্মপ্রকাশ করছে। আশা করি এটাও অন্যান্য সংকলনের মতোই শিলঙে ও বাইরে রসিকমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

'শিলঙের কবিতা' ১ম বর্ষ, ১ম সংকলন, হৈমন্তী সংখ্যা 'অমৃত'-এ আলোচিত হয়েছে, তাছাড়া দেশের 'সাহিত্য-সংবাদ' বিভাগেও 'শিলঙের কবিতা'র কথা পরিবেশন করা হয়েছে। বহির্বঙ্গের এই কাব্য-আন্দোলনকে এ-দুই পত্রিকার কৃর্তপক্ষ উৎসাহিত করছেন। তাই এঁদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

দুই

আধুনিক কবিতা অনেকের কাছে দুর্বোধ্য। এ-দুর্বোধ্যতা কি সাম্প্রতিক গীতিকবিতার—না, চিরকালের গীতি কবিতার? আর দুর্বোধ্য-ই বা কেন? কবিতার ভাষাকে তো মুখের ভাষার কাছাকাছি এনে দিয়েছেন অনেক গীতিকবি-ই— তবু কেন তা দুর্বোধ্য? তাই বলতে হয় সকলেই কবিতার সমঝ্‌দার— না, কবিসুলভ অনুভূতি-পরায়ণ পাঠকরাই কবিতার রসপায়ী? না, কবিতার রস-সরোবরের রাজহংস হতে হলে শুধু কবি-মন থাকলেই চলে না— এর সঙ্গে চাই একনিষ্ঠ কাব্যচর্চা যা স্বচ্ছ করে তোলে কবিতার কথার আড়ালের কথা, ইঙ্গিত বা ব্যঞ্জনা। স্পষ্ট করে তোলে কবির প্রকাশভঙ্গি, জীবনদর্শন, যুগযন্ত্রণা, সমাজ-চেতনা আর সমকালীন রচনারীতি। আর এ-দুটোর অভাব হলেই কবিতা হয়ে ওঠে পাথরের মতো কঠিন, পাহাড়ের মতো দূরতিক্রম্য ও মহাকাশের মতো রহস্যাবৃত—কবিতা হয়ে ওঠে অ-স্বচ্ছ, অ-সরল, দুর্বোধ্য ও দুরূহ। তাই

"পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

"উজ্জ্বল, ক্ষুধিত জাগুয়ায় যেন
এপ্রিলের বসন্ত আজ" (সমর সেন)

"পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন" (জীবনানন্দ দাশ)

"বাষ্পময় প্রকৃতির অসুস্থ বাতাস
যে-বাতাসে অন্ধকারে স্বভাবত ফুলে ওঠে গোখরো, ময়াল"(বিষ্ণু দে)

বল্কল বসন দাও, রসসিক্ত ফল, দ্বিধাহীন হয়ে একটু শুয়ে থাকি
শেষ প্রহরের আগে
এই হত্যাকারী হাতে শেষবার প্রণাম জানাই" (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়) ইত্যাদি শুনে অনেকেই আকাশ থেকে পড়েন।

তিন

'অণু-কবিতা' মিশ্রকলাবৃত্তছন্দের প্রবহমান মহাপয়ারের বাঁধুনিতে চার পংক্তির নতুন ধরনের কবিতা সৃষ্টির প্রয়াস। প্রত্যেক পংক্তিতে আট-আট ছয় বা দশ মাত্রাবিভাগ এবং প্রত্যেক আট-মাত্রায় লঘুযতি ও ছয় বা দশ মাত্রায় পূর্ণযতি পড়ে। ভাবের দিক থেকে প্রত্যেক পংক্তি স্বয়ং সম্পূর্ণ। তবে তৃতীয় পংক্তিতে বিশেষ কোনও পরিস্থিতিতে অব্যয়ের ব্যবহার হতে পারে।

'অণু-কবিতা'র প্রথম দু'পংক্তি এবং দ্বিতীয় দু'পংক্তি দু'টি স্বতন্ত্র অমিল যুগ্মক। সনেটের অষ্টকের মতো প্রথম যুগ্মক বহন করে কবিতার কেন্দ্রীয় অনুভূতি এবং ষটকের মতো দ্বিতীয় যুগ্মক বহন করে কবিতার সমাপ্ত অনুভূতি। এই দুই স্তরে প্রকাশ পায় কবির সম্পূর্ণ অনুভূতি।

'অণু-কবিতা'র সঙ্গে চতুষ্ক, জাপানি হাইকু কবিতা বা ফারসি চতুষ্পদীর আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত মিলের চেয়ে অমিল-ই বেশি। বরং এটাকে সনেটের অণু সংস্করণ বলা যেতে পারে।

'অণু-কবিতা' সৃষ্টির ব্যাপারে আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছে আসামের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ শ্রীযুক্ত সত্যেন মজুমদার এবং শ্রীরণবীর চক্রবর্তী ও নিলয়কান্তি নন্দী।

উসনেঙ রোড — রমানাথ ভট্টাচার্য
শিলং-১১ — ২৫-১১-৭০ ইং

শিলং-এর কবিতা ২য় বর্ষ প্রথম সংকল হৈমন্তী সংখ্যা সম্পাদনা রমানাথ ভট্টাচার্য

অণু কবিতা : সবুজ আলোক

রমানাথ ভট্টাচার্য

বেদনার— আগুনের ভালোবাসা— পরিব্যাপ্ত সকল— হৃদয়,
মরণের গন্ধ-ভরা আকাশ- বাতাস এই, পাড়াগাঁ নগর।

তবু চায় সবে চায় সোনালি জীবন আর সাজানো বাগান
দৈনন্দিন মৃত্যু-বুকে কামনার এল্ডোরেডো সবুজ আলোক-

ধানসিড়ি বেয়ে বেয়ে...

জীবনানন্দ জীবনের— মহাজীবনের কবি। সে জীবন ও মহাজীবনের পরিধিতে আছে মানুষ ও প্রকৃতি, আছে মহাকাল ও মহাপৃথিবী। রবীন্দ্রনাথের কবিতা যেমন সসীমের সঙ্গে অসীমের মিলনসাধনের পালা, জীবনানন্দের কবিতা তেমনি মহাকালের সঙ্গে অধুনার ও অধুনার সঙ্গে মহাকালের সেতুবন্ধন— মিলনসঙ্গীত।

মানুষ ও প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে পল্লবিত কুসুমিত হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতার কল্পতরু— গড়ে ওঠেছে তাঁর কবিতার রাজগৃহ। তাঁর কবিতায় আছে যন্ত্রসভ্যতাক্লিষ্ট মানুষের বেদনা, আছে প্রেম-অপ্রেম, আছে বিশ্বাস অবিশ্বাস, আছে সংশয় দ্বন্দ্ব, আছে মানুষের আত্মিক মৃত্যুর জন্যে করুণ ক্রন্দন। জীবন যেরকম সেভাবেই কবি দিয়েছেন তার রূপ, করেছেন তার প্রকাশ। অধুনার প্রেক্ষাপটে সে জীবন হয়ে উঠেছে শাশ্বত— চিরন্তন। সে জীবন প্রকৃতির সঙ্গে— মহাবিশ্বের সঙ্গে গেছে মিশে, মহাকাল ও মহাপৃথিবীর অন্তরাত্মার সঙ্গে হয়ে গেছে এক।

সৃষ্টির আহ্বানে গড়ে উঠেছে জীবনানন্দের কবিতা— তাঁর কাব্যলোক। সময়সিন্ধুর শরীরে যে তরঙ্গ ওঠে সে তরঙ্গ-ই জলতরঙ্গ হয়ে বেজে উঠেছে তাঁর কাব্যে। তাই জীবনানন্দ হয়েছেন জীবনের— মহাজীবনের রূপকার— মহাশিল্পী। আর নিরাসক্ত দৃষ্টিতেই দেখেছেন জীবনকে— মহাজীবনকে।

যন্ত্রসভ্যতাক্লিষ্ট পৃথিবী। যুদ্ধোত্তর বিধ্বস্ত পৃথিবী। প্রেম, ভালোবাসা, মানবতা শীতকালীন বৃক্ষের মতো সঙ্কোচিত— সুকোমল বৃত্তিগুলি ঝরে যাচ্ছে শুকনো পাতার মতো। সর্বত্র মানবতার অমোঘ মৃত্যু। পৃথিবীর সর্বত্র বেদনার বেহাগরাগ— বেদনার আগুন। জীবনানন্দের কাব্য হয়ে উঠলো বিষাদের গান— বেদনার সঙ্গীত। তাঁর কাব্যে এ বিষাদ এ বেদনা শুধু যুদ্ধোত্তর রোগগ্রস্ত পৃথিবীর আর্তনাদ নয়— তাঁর কবি-আত্মারও স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ।

বেদনার্ত কবিচিত্ত পৃথিবীর মাটিতে আশ্রয় পায় না— ভেসে যায় মহাপৃথিবীর দিকে;

শকুনের মতো শূন্যে পাখা বিথারিয়া...
উঠিলাম উথলিয়া দুরন্ত সৈকতে—
দূর ছায়াপথে। (সেদিন এ ধরণীর, ঝরাপালক)

দুর্নিবার 'মাটিমা'র আকর্ষণ— অপ্রতিরোধ্য মৃত্তিকার টান। মাটির মানুষের ডাকে কবি আত্মা ফিরে আসে রোগগ্রস্ত— বেদনাবিধুর— ক্রন্দসী পৃথিবীতে। দীপ্তকণ্ঠে কবি উচ্চারণ করেন :

পৃথিবীর পথ ছেড়ে আকাশের নক্ষত্রের পথ
চায় না সে? করেছে শপথ
দেখিবে সে মানুষের মুখ?
দেখিবে সে মানুষীর মুখ?
দেখিবে সে শিশুদের মুখ?
চোখে কালো শিরার অসুখ,
কানে যেই বধিরতা আছে,
সেই কুঁজ— গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে
নষ্ট শসা— পচা চালকুমড়ার ছাঁচে,
যে সব হৃদয়ে ফলিয়াছে
—সেই সব। (বোধ, ধূসর পাণ্ডুলিপি)

না, হতাশার বেদনার পৃথিবীতে, অগ্নিপরিধির পৃথিবীতে পথহাঁটা— দিনযাপন অসহ্য— অসম্ভব। কবি চান শান্তি— অমল শান্তি। প্রেমের শিশির-সমুদ্রে স্নান করে কবি পেতে চান শান্তি:

অনেক লবণ ঘেঁটে সমুদ্রের পাওয়া গেছে এ মাটির ঘ্রাণ,
ভালোবাসা আর ভালোবাসার সন্তান,
আর সেই নীড়,
এই স্বাদ— গভীর— গভীর। (পাখিরা, ধূসর পাণ্ডুলিপি)

*　　*　　*

মৃগীর মুখের রূপে হয়তো চিতারও বুকে জেগেছে বিস্ময়!
লালসা-আকাঙ্ক্ষা- সাধ-প্রেম- স্বপ্ন স্ফুট হয়ে উঠিতেছে সব দিকে
আজ এই বসন্দের রাতে... (ক্যাম্পে, ধূসর পাণ্ডুলিপি)

কবি শান্তি খুঁজলেন বাংলার সুষমার রাজ্যে— রূপসী বাংলার কোলে। বাংলার অপার রূপে মুগ্ধ হলেন কবি— চাইলেন কাঙ্ক্ষিত শান্তি:

এখানে আকাশ নীল— নীলাভ আকাশ জুড়ে সজিনার ফুল
ফুটে থাকে হিম শাদা—রং তার আশ্বিনের আলোর মতন;
আকন্দফুলের কালো ভীমরুল এইখানে করে গুঞ্জরণ
রৌদ্রের দুপুর ভ'রে— বার-বার রোদ তার সুচিক্কণ চুল
কাঁঠাল জামের বুকে নিঙড়ায়— দহে বিলে চঞ্চল আঙুল
বুলায়ে-বুলায়ে ফেরে এইখানে জাম লিচু কাঁঠালের বন,...
(এখানে আকাশ নীল, রূপসী বাংলা)

না রূপসী বাংলার বুকে, না চিরন্তন প্রেমের কোলে আশ্রয় পেলেন কবি, বাংলার অপার রূপ কবিকে পারলো না শান্তি দিতে— চিরন্তন প্রেম পারলো না কবিকে আশ্রয় দিতে। ক্ষণিক প্রেমে কবি চাইলেন শান্তি :

আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।
(বনলতা সেন, বনলতা সেন)

ক্ষণিক প্রেমেও আশ্রয় পেলেন না কবি। প্রেমে— ক্ষণিক প্রেমেও হারালেন বিশ্বাস। প্রেমবিহঙ্গীর উদ্দেশ্যে বেদনাবিধুর কণ্ঠে কবি উচ্চারণ করলেন:

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে!
(হায় চিল, বনলতা সেন)

*　　*　　*

এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর।
(শঙ্খমালা, বনলতা সেন)

*　　*　　*

সোনালি সোনালি চিল— শিশির শিকার করে নিয়ে গেছে তারে...
(কুড়ি বছর পরে, বনলতা সেন)

কবি প্রকৃতিমুখী হয়ে ওঠেন। প্রকৃতির কোলে চান শান্তি— চান আশ্রয়:

আমি যদি হতাম বনহংস,
বনহংসী হতে যদি তুমি...
আজকের জীবনের টুকরো টুকরো মৃত্যু আর থাকতো না;
থাকতো না আজকের জীবনের টুকরো টুকরো সাধের ব্যর্থতা ও অন্ধকার...
(আমি যদি হতাম, বনলতা সেন।)

অসহায় কবি মহাকালের কোলে— মহাপৃথিবীর রাজপথে— মৃত্যুর হিম শীতল হৃদয়ে— প্রকৃতির শান্ত স্নিগ্ধ বুকে চান স্থিতি। মহাকাল, মহাপৃথিবী, মৃত্যু ও প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে চায় তাঁর আত্মা:

আমার হৃদয় পৃথিবী ছিঁড়ে উড়ে গেল,
নীল হাওয়ার সমুদ্রে স্ফীত মাতাল বেলুনের মতো গেল উড়ে
একটা দূর নক্ষত্রের মাস্তুলকে তারায় তারায় উড়িয়ে নিয়ে চলল
একটা দুরন্ত শকুনের মতো। (হাওয়ার রাত, বনলতা সেন)

*　　*　　*

ভারত সমুদ্রের তীরে
কিংবা ভূমধ্যসাগরের কিনারে
অথবা টায়ার সিন্ধুর পারে
আজ নেই, কোনও এক নগরী ছিল একদিন,
কোনো এক প্রাসাদ ছিল;
মূল্যবান আসবাবে ভরা এক প্রাসাদ

পারস্য গালিচা, কাশ্মিরি শাল, বেরিন তরঙ্গের নিটোল মুক্ত প্রবাল, আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা,

আর তুমি নারী—

এই সব ছিল সেই জগতে একদিন।

(নগ্ন নির্জন হাত, বনলতা সেন)

*　　*　　*

ধানসিড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়ে থাকব— ধীরে— পউষের রাতে—

কোনোদিন জাগব না জেনে—

কোনোদিন জাগব না আমি— কোনোদিন আর—

(অন্ধকার, বনলতা সেন)

কবি প্রকৃতির রাজ্যে— মহাপৃথিবীর সরণিতে চান আশ্রয়, মৃত্যুর দেশে-মহাকালের কাছে পেতে চান শান্তি; কারণ পৃথিবীতে প্রেম নেই— ভালোবাসা নেই— নেই মানবতা। পৃথিবীর ভাণ্ডার শূন্য, শূন্য মরুভূমি:

তোমার হৃদয় আজ ঘাস

বাতাসের ওপারে বাতাস—

আকাশের ওপারে আকাশ।

(আকাশলীনা, সাতটি তারার তিমির)

*　　*　　*

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ,

যারা অন্ধ সব চেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা;

যাদের হৃদয়ে কোনও প্রেম নেই— প্রীতি নেই— করুণার আলোড়ন নেই

পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া...

(অদ্ভুত আঁধার এক, বেলা-অবেলা কালবেলা)

জীবনানন্দের কাব্যলোক পরিক্রমা করে মনে হতে পারে রক্তাক্ত তাঁর হৃদয়, ত্রিশঙ্কু তাঁর অবস্থা— মনে হতে পারে নিদারুণ হতাশা বেদনার শিকার হয়ে শুধু সংশয় দ্বন্দ্বেই আন্দোলিত হয়েছেন কবি এবং কোনও স্থির প্রত্যয়-ভূমি পাননি খুঁজে। তাই বারবার পট পরিবর্তন, পথপরিবর্তন, ঋতু বদল করেছেন কবি— কখনও মৃত্যুর শীতল কোলে, কখনও নিসর্গের দেশে, কখনও অপার রূপসমুদ্রে, কখনও মহাকাল ও মহাপৃথিবীর রাজ্যে আশ্রয় খুঁজেছেন; আর কোনওখানেই পাননি তাঁর কাঙ্ক্ষিত নীড়। তাই করুণ রাগিনীতেই বাজিয়েছেন কাব্যভারতীর বীণা, তাই তাঁর কবিতাগোমুখী থেকে নেমেছে করুণ রসের বন্যা।

জীবনানন্দের কাব্যে বিষাদের ছায়া পড়েছে— করুণ রসের প্লাবন নেমেছে— তাঁর কবিতা হয়ে ওঠেছে বেদনার কবিতা তা ঠিক এবং তা হয়েছে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর রুগ্ন চেহারার রূপ দিতে গিয়ে— কবির বিষাদাচ্ছন্ন মানসিকতার প্রকাশ করতে গিয়ে—

সর্বোপরি আনন্দের কবি রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যের প্রতিকূল পরিমণ্ডল রচনা করতে গিয়ে। তাই বলে কবি কোনো প্রত্যয় ভূমিতে এসে পৌঁছতে পারেননি এমনভাবে ভেবে নেওয়া ঠিক নয়। কারণ তাঁর কাব্যজীবনের শুরু থেকেই জন্মজন্মান্তরের পথ ধরে—মহাকালের পথধরে প্রকৃতির (বিষদ অর্থে মহাপৃথিবীর) শান্ত স্নিগ্ধ দেহের সঙ্গে, তার প্রাণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবার জন্যে তাঁর দুর্মর ইচ্ছা ব্যক্ত হয়েছে এবং এই ইচ্ছা পক্ষচ্ছায়া বিস্তার করেছে তাঁর সমস্ত কাব্যপরিধির পথে রাজপথে। তাই জীবনানন্দ প্রধানত প্রকৃতির কবি। এমন কি তাঁর শেষের দিকের কবিতা, যেখানে জীবনানন্দ অনেক বেশি বাস্তব-সচেতন সেখানেও প্রকৃতি প্রেম তাঁর অক্ষুণ্ণ, প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবার জন্যে দুর্বার তাঁর ইচ্ছা, অখণ্ড তাঁর বাসনা।

...চোখ ঝলসানো আলো
ভালোবেসে ষোলো আনা নাগরিক যদি
না হয়ে বরং হ'তো ধানসিড়ি নদী (সে, বেলা অবেলা কালবেলা)

জীবনানন্দের কবিতাবেদনা সমুদ্র হতে পারে— জীবনানন্দ সাধারণভাবে হতে পারেন প্রকৃতির কবি। কিন্তু তাঁর কবিতার বিরাট অংশ জুড়ে বেজে ওটে মহাকাল ও মহাপৃথিবীর পদধ্বনি— যাত্রার নিঃস্বন। তাই তার কাব্য গীতিকাব্য হ'য়েও পেয়েছে মহাকাব্যের মতো বিস্তৃতি— হয়েছে মহাকাব্যের মতো স্বাদনীয়, আর কবি হয়ে ওঠেছেন মহাকবি।

ঋতুরঙ্গ ২য় বর্ষ প্রথম সংকলন ডিসেম্বর ১৯৭২, সম্পাদনা: রমানাথ ভট্টাচার্য

ঋতুরঙ্গ ৩

বিলম্বিত লয়ে 'ঋতুরঙ্গ' আত্মপ্রকাশ করলো। তার প্রথম কারণ ভালো লেখার অভাব। দ্বিতীয় কারণ পত্রিকার কেউ কেউ বিভিন্ন কাজে দীর্ঘদিন শিলঙের বাইরে ছিলেন।

আজকাল বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পত্রিকা বেরুচ্ছে। কিছু কিছু পত্রপত্রিকা সত্যিই দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো সাহিত্যপত্র যা সাহিত্যরসিককে আনন্দ দেবার মতো উপকরণে সাজানো। বাদবাকী বহু পত্রিকাই সাহিত্যের নামে অসাহিত্য— লজ্জাহীন আত্মপ্রচার বা আত্মগুণগানের মুখপত্র। কোনোকোনোটি উৎকট গোষ্ঠীবদ্ধতার শিকার হয়ে অকবিকে দিচ্ছে কবির শিরোপা, অসাহিত্যিককে দিচ্ছে সম্মানের বরমাল্য। সাহিত্যের নামে এই উত্তেজনা, এই ঢাকপেটানো, এই আত্মঘোষণা অহঙ্কারবশত, না স্বীকৃতির জন্য? অহঙ্কার বশত হলে বলতে হয় অগাধজলসঞ্চারী বিকারী নৈব রোহিতঃ— নীরবে নিঃশব্দেই তার পথচলা,— তাই বলে সে কি নিরহঙ্কার বা অহঙ্কারশূন্য? তা হলে নিশ্চয় স্বীকৃতির জন্য? ভালো কবিতা বা সৎসাহিত্যের জন্ম দিতে পারলে স্বীকৃতি অমনিতেই আসে— উত্তেজনার প্রয়োজন হয় না। কবি মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ কি জীবনানন্দ বা কথাশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর কি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-যে স্বীকৃতির জন্য উচ্চকণ্ঠ বা সরব হয়ে উঠেননি তাই বলে রসিকজন কি এঁদের মতো বিরাট প্রতিভাকে যথাযথভাবে চিনে নিতে বিন্দুমাত্র ভুল করেছেন?

আসলে এ সব পত্রিকা আর যাই হোক সাহিত্যের বাহন নয়, কবিতার বাহক নয়, সাধারণ পাঠককে বিভ্রান্ত করার মতো আলেয়া বা বিদ্যুৎচমক। সত্যিকারের কোনও সাহিত্যপত্রই অসাহিত্য বা চালবাজির ছায়াতলে বেড়ে ওঠে না— গলাবাজি বা ঢাকপেটানো তার স্বভাববিরুদ্ধ। সাহিত্যের এই আবহাওয়ায় 'ঋতুরঙ্গ' যেন দিশাহারা না হয়— বিভ্রান্তির কবলে না পড়ে— ফাঁকি নয়— চালবাজি নয়— ভণ্ডামি নয়, দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ও সাহিত্যের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসাই যেন তার একমাত্র পুঁজি বা পাথেয় হয়। কারণ, সাহিত্যপত্র বা কবিতাপত্র প্রচারযন্ত্র নয়— মহৎ শিল্প। আর মহৎ শিল্পের রাজ্যে স্বাক্ষর রাখতে হলে অকৃত্রিম ভালোবাসাতেই তা সম্ভব আন্তরিক পরিশ্রমই তার একমাত্র উপায়।

কেউ কেউ ভাবতে পারেন এ ধরনের আলোচনা এও এক ধরনের আত্মপ্রচার। না, এ-রকমের কোনও মনোবৃত্তির পীড়নে কথাগুলো বলা হয়নি— সমকালীন বহু পত্রপত্রিকা পড়ে দুঃখবেদনা বা ক্ষোভ থেকেই এসব কথা বলা হলো।

ঋতুরঙ্গ রসিকজনকে তৃপ্তি দিতে পারলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক মনে করবো।

শিলং
ডিসেম্বর, ১৯৭৩

কবিতা সম্পর্কে কিছু ভাবনা চিন্তা

বেদনা থেকেই সব শিল্পের জন্ম। কবিতা শিল্প। বেদনা থেকেই কবিতারও জন্ম। যে মুহূর্তে বা যে সময়ে কবি নৈর্ব্যক্তিকভাবে ভাবগ্রস্ত হন সে মুহূর্তে বা সে সময়েই জন্ম নেয় কবিতা। অথবা যে সময়ে কবির হৃদয়ে অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত ভাবের জলতরঙ্গ বাজতে থাকে কিংবা ভাবের বিদ্যুৎচমক হতে থাকে তার মনোরাজ্যে সে সময়েই জন্ম নেয় নতুন কবিতা। প্রেম কিংবা অপ্রেম, হিংসা অথবা দ্বেষ, সুখ কি বেদনাকে কেন্দ্র করে জন্ম দিতে পারে কবিতা। কবিতার জন্ম হতে পারে নিসর্গ, জাগতিক জীবন বা মহাজীবনকে কেন্দ্র করে। অর্থাৎ জীবনের যে কোনও অভিজ্ঞতা, মহাজীবন সম্বন্ধে যে কোনও ধ্যান ধারণা যা কবিকে ভাবিয়ে তুলে কিংবা আলোড়িত করে তার মনকে তা-ই কবিতার জন্ম দিতে সক্ষম। তবে কবির যে কোনও রকমের ভাবগ্রস্ততার সঙ্গে কল্পনায় হরপার্বতী যোগ হতে হয়— কল্পনার রসে তার ভাবগ্রস্ত পারিপার্শ্বিকতা সঞ্জীবিত হতে হয়, আলো রঙে হতে হয় উজ্জ্বল। অর্থাৎ কবির ভাবগ্রস্ত পারিপার্শ্বিকতা ও কল্পনার মিলনেই কবিতার জন্ম।

প্রশ্ন ওঠে কবিতা কি? কবিতা মানে কথার আড়ালে কথা— শেষের আড়ালে অশেষ। কবিতা মানে যে কথা গানের মতো বা সুরের মতো কানের ভিতর দিয়ে হৃদয়কে স্পর্শ করে— গানের মতো বা সুরের মতোই হৃদয়ে বাজতে থাকে। তাই আলো আঁধারি তার ভাষা— ব্যঞ্জনা, প্রতীক বা চিত্রকল্পে তার প্রকাশ,— ব্যঞ্জনা, প্রতীক বা চিত্রকল্প তার আত্মা। কবিতা তাই অধরা অছোঁয়া এক সঙ্গীত যা পঞ্চেন্দ্রিয়কে স্পর্শ করে— মনোরাজ্যে এনে দেয় সোনার কাঠির স্পর্শ— উদ্ভাসিত করে নতুন স্বর্গখণ্ড। তাই—

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ-মকন্দ বিন্দু বিন্দু চূয়ত
বিকসিত ভাব-কদম্ব।।

(গোবিন্দ দাস)

কলকোকিল অলিকূল বকুলমূলে।
বসিলা অন্নপূর্ণা মণিদেউলে।।
কমল পরিমল লয়ে শীতল জল—
পবনে ঢলঢল উছলে কূলে।।

(ভারতচন্দ্র)

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার;
দিনের ভাটার শেষে রাত্রির জোয়ার
এল তার ভেসে-আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে...

(রবীন্দ্রনাথ)

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য...

(জীবনানন্দ দাশ)

ইত্যাদি অংশ হয়ে উঠেছে যথার্থ কবিতা।

প্রশ্ন থেকে যায় কবিতা গদ্যের মতো স্পষ্ট হলে কোন্ মহাভারত অশুদ্ধ হয়? আলো-আঁধারি ভাষার মাধ্যমে কবিতা রচনা করে— প্রতীক-ব্যঞ্জনা বা চিত্রকল্পের সাহায্যে কথাকে ভাষা দিয়ে মানুষের কোন্ কল্যাণ হয়?

কবিতা গদ্যের মতো স্পষ্ট হলে বা ঋজু হলে গদ্য পড়ে যে রকম আনন্দ মিলে কবিতা পড়েও মিলে সেইরকম আনন্দ। গদ্য পড়ার আনন্দের মতোই নিমেষে শেষ হয়ে যায় কবিতা পড়ার আনন্দ। কবিতা গদ্যের মতো হলে হৃদয় পৌঁছুতে পারে না কোনও মায়াময় ছায়াময় রাজ্যে— অতীন্দ্রিয় কোনও জগতে— মনোরাজ্যে গড়তে পারে না কোনও সুষম পৃথিবী। কবিতা গদ্যের মতো স্পষ্ট হলে তা গদ্যেরই নামান্তর— সাধারণ পাখির স্বরের মতোই তার আবেদন, কোকিলের গানের মতো করে না তা আকর্ষণ। এ কারণেই 'গীতাঞ্জলি', 'সোনার তরী' বা 'বালাকা'র বেশির ভাগ কবিতার মতো আনন্দ উদ্দীপক নয় 'পুনশ্চ'র বহু কবিতা। এ কারণেই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'বনলতা সেন' বা 'রূপসী বাংলা'র বহু কবিতার মতো আনন্দদায়ক নয় জীবনানন্দের শেষের দিকের বেশির ভাগ কবিতা। তাই—

...আমার ভাগ্যটা যেন ঘোলা জলের ডোবা
বড়ো রকম ইতিহাস ধরে না তার মধ্যে,
নিরীহ দিনগুলো ব্যাঙের মতো একঘেয়ে ডাকে,
না সেখানে হাঙর- কুমিরের নিমন্ত্রণ, না রাজহাঁসের।। রবীন্দ্রনাথ

* * *

সুজাতা এখন ভুবনেশ্বরে;
অমিতা কি মিহিজামে?
বহুদিন থেকে ঠিকানা না জেনে ভালোই হয়েছে— সবই।
ঘাসের ভিতরে নীল সাদা ফুল ফোটে হেমন্তরাগে;

সময়ের এই স্থির এক দিক্,
তবু স্থিরতর নয়;
প্রতিটি দিনের নতুন জীবাণু আবার স্থাপিত হয়।

ইত্যাদি অংশ ব্যঞ্জনার অভাবে— যথার্থ কবিতা হয়ে উঠতে পারেনি। কারণ, কবিতা থেকে যে অশরীরী আলো (তা আঁধার রঙের হোক বা জোৎস্না রঙের হোক), অরণ্যের যে সবুজ স্নিগ্ধতা, রামধনু রঙের যে বাহার, নীলাকাশের যে সুষমা বিচ্ছুরিত হয় এসব অংশে একান্তভাবেই তা অনুস্পস্থিত। চিত্রকল্পের ব্যবহারে এই দুই অংশ কাব্যিক গদ্য হয় উঠেছে— আঙ্গিকের দিক থেকে হয়ে উঠেছে পদ্য। এসব অংশ কবি এলিয়ট বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অধিকাংশ কষিতার মতো নতুন কাব্যরীতির চমক দেয় এবং চমক ভেঙে গেলেই অনিবার্যভাবে কবিতার গদ্যে রূপান্তর হয়।

কবিতা কল্যাণ করে— কল্যাণের চেয়েও মহৎ কিছু করে কবিতা। বাস্তব পৃথিবীর দুঃখ বেদনার নরক থেকে উদ্ধার করে মানুষকে দেয় স্বপ্নলোকের দুর্লভ স্পর্শ। কবিতা মনকে জ্যোৎস্নার মতো স্নিগ্ধ করে— তপস্বীর মতো উন্নীত করে হৃদয়কে— গঙ্গাধারার মতো হৃদয়ের সব মালিন্য—সব সংকীর্ণতা ধুয়ে মুছে সুকোমল বৃত্তিগুলোকে ফুলের মতো সুন্দর করে— মানুষকে করে মহৎ। কবিতা জীবন সম্বন্ধে জাগায় জিজ্ঞাসা, জীবনের গভীরে ডুব দিতে সাহায্য করে কবিতা। জীবনের রহস্য উদঘাটন করতে— জীবনকে জানতে, মহাজীবনের সংবাদ দিতে, জীবন ও মহাজীবন ব্যপী বেদনার যে সঙ্গীত বাজে, আনন্দের যে ধ্বনি উচ্চারিত হয়, মিথ্যার যে ফানুস ওড়ে কবিতা তাকে ভাষা দিয়ে উদ্ভাসিত করে সত্যের আলো। জীবন ও মহাজীবন ব্যাপী অজানার কুয়াশার যে আস্তরণ কবিতা তা অপসারণ করে স্থির প্রত্যয় ভূমিতে মানুষকে দাঁড় করায়— মানুষ সত্যের আলোকে দেখে মুখ।

কবিতা আনন্দ দেয়। অশেষ আনন্দ দেয় কবিতা। প্রেমিক প্রেমের স্মৃতিচারণে, সঙ্গীত রসিক সঙ্গীতে, চিত্র কলার সমঝদার চিত্রে, তাপস তপোব্রতে যে আনন্দ পান কাব্য রসিক কবিতায় পান সে আনন্দ! তাই—

শুধু কবিতার জন্য এই জন্ম, শুধু কবিতার
জন্য কিছু খেলা, শুধু কবিতার জন্য একা হিম সন্ধেবেলা
ভুবন পেরিয়ে আসা, শুধু কবিতার জন্য
অপলক মুখশ্রীর শান্তি এক ঝলক;
শুধু কবিতার জন্য তুমি নারী...

(সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

প্রশ্ন ওঠে সব কবিতাই কি কল্যাণ করে? মানুষকে কাদামাটি কলুষ কালিমার আর্বত থেকে উদ্ধার করে? সব কবিতাই কি মানুষকে আনন্দ বিতরণে সক্ষম? না, সব কবিতা আনন্দ দেয় না, দুঃখ বেদনা, কলুষ কালিমার সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে না মানুষকে, সব

কবিতা আনন্দ দেয় না, জীবন সম্বন্ধে জাগায় না জিজ্ঞাসা, জীবনের অতলের ডুব দিতে করে না সাহায্য। কিছু কবিতা আছে যেগুলো স্থূল-রুচির বাঙময় প্রকাশ— কামক্রীড়ার উজ্জ্বল অভিব্যক্তি— কাব্যাকারে 'কামসূত্র'। কিছু কবিতা আছে যা বরনারী নয়, বারনারীর মতো মানুষকে উত্তেজিত করে— কামনার আগুনে মারে পুড়িয়ে। যেমন

... মজ্জ্বং পিআমো মহিলং রমামো
মোক্খং চ জামো কুলমগ্ গলগগা।। (রাজশেখর)
শ্লিষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি কামপি রময়তি রামাম্।
পশ্যতি সস্মিতচারুপরামপরামনুগচ্ছতি রামাম্।। (জয়দেব)

দেখিয়া সুন্দর রূপ মনোহর
স্মরে জরজর যত নারী।
কবরী ভূষণ কাঁচুলিকষণ
কটির বসন খসে অমনি।। (ভারতচন্দ্র)

রাজশেখরের 'কর্পূর মঞ্জরী'র অনেক শ্লোক, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-এর অনেক অংশ, ভারতচন্দ্রের কিছু কিছু কবিতা আলোর বদলে আলেয়া, কবিতার আড়ালে অকবিতা, বরনারীর বদলে বারনারীর বন্দনা। নারীহৃদয়ের রহস্য উদঘাটনের জন্য নয়— প্রেমে-অপ্রেমে, সুখে-দুঃখে তার হৃদয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অভিব্যক্তির জন্য নয় অথবা সৌন্দর্য পিপাসার নিবৃত্তির জন্য নয়, কবিতার আকারে 'কামসূত্র'-এর উপস্থাপনার জন্যই এ সব কবিতা বা কাব্যাংশ। এ ধরনের কবিতা মানুষের মঙ্গলের জন্য নয়, অমঙ্গলের জন্য। মানুষকে জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতা দেওয়ার জন্য নয়, মানুষকে কামনার আগুনে দগ্ধ করার জন্য। এ ধরনের কবিতা ছলনার স্বর্গ, আলোর আড়ালে আগুনের সমুদ্র। তাই ফিরিয়ে নিয়ে হয়

শুধু কবিতার জন্য এই জন্ম, শুধু কবিতার
জন্য কিছু খেলা...

ঋতুরঙ্গ ৩য় বর্ষ ১৩৮০ পৌষ ১ম সংকলন ১৯৭৩, সম্পাদনা- রমানাথ ভট্টাচার্য।

সাহিত্য ও আঞ্চলিকতা

সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন সাহিত্যপত্র বেরুচ্ছে। এইসব পত্রপত্রিকার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আঞ্চলিকতার প্রেক্ষিতে গল্প কবিতা লেখা এবং উদ্দেশ্য অঞ্চলভেদে সৎকবি বা সৎসাহিত্যিক আবিষ্কার। যেহেতু এইসব পত্রপত্রিকা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বেরোয় সে কারণে জামশেদপুর বা দুর্গাপুর, কলকাতা বা কোচবিহার, শিলং বা শিলচর, আগরতলা বা মেদিনীপুর থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার মধ্যে রুচির ও মেজাজের পার্থক্য থেকে যায় এবং এ পার্থক্য ব্যক্তি বা অঞ্চলের ব্যবধানে অনিবার্যভাবেই হয়ে থাকে। তাই এ সব পত্রপত্রিকার গল্প-কবিতায়, চিত্রকল্প বা শব্দ ব্যবহার, ডিকশন বা টেকনিক এবং ভাবগত দিক থেকে স্বাতন্ত্র্য থেকে যায়।

সাহিত্যে আঞ্চলিকতা উচিত কি অনুচিত এই নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন। কেউ কেউ ভাবছেন যেহেতু কলকাতা বাংলা সংস্কৃতির রাজধানী সে কারণে কলকাতার পত্রপত্রিকার মতোই হওয়া উচিত আঞ্চলিক পত্রপত্রিকার চরিত্র ও মেজাজ, আত্মা ও শরীর। অর্থাৎ চিত্রকল্প, শব্দ ব্যবহার, ডিকশন বা ভাবগত দিক থেকে আঞ্চলিক পত্রপত্রিকাগুলিও কলকাতার পত্রপত্রিকার মতো হওয়াই সমীচীন। ভাবখানা এই আঞ্চলিক সাহিত্য কলকাতা মুখীন না হলে বাংলা সাহিত্যের মূলধারা থেকে হচ্ছে বিচ্যুত অথবা বাংলা সংস্কৃতির পীঠস্থান কলকাতা ছাড়া যথার্থ সৎসাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে না— জন্মানো সম্ভব নয়। এধরনের চিন্তাধারা কলকাতা প্রীতি, না আঞ্চলিক সাহিত্যের প্রতি উন্নাসিক দৃষ্টি? কলকাতা কাউকে কবি সাহিত্যিক করে না, ব্যক্তিগত রুচি বা মেজাজ অথবা প্রতিভা থেকেই কবি সাহিত্যিক হন। আর আঞ্চলিক কবি সাহিত্যিক ইচ্ছে করলেই কলকাতামুখী হতে পারেন না, কারণ, কলকাতা ও বিভিন্ন অঞ্চলের জীবনবোধ, অভিজ্ঞতা বা পারিপার্শ্বিকতা এক বা অভিন্ন নয়। এই জীবনবোধ, অভিজ্ঞতা, পারিপার্শ্বিকতার ভিন্নতার জন্যই কলকাতা ও অন্যান্য অঞ্চলের সাহিত্যপত্রিকার ডিকশন বা উপাদানে আকাশ পাতাল ফারাক। আর কবিতা যেহেতু অবচেতন মনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার রূপরেখা এবং গল্প যেহেতু অভিজ্ঞতা ও জীবনদৃষ্টির ফসল সে কারণেও একেক অঞ্চলের সাহিত্যকর্মে স্বাভাবিক ভাবেই এক এক অঞ্চলের ছায়াপাত। এ কারণেই তারাশঙ্করের গল্প উপন্যাসে দক্ষিণরাঢ়ের মাটির গন্ধ, বনফুল ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্মে অন্তত আংশিকভাবেও বিহারের জনজীবনের প্রতিধ্বনি, শিলচর শিলঙ, কোচবিহার বা নদীয়া অঞ্চলে কবিতার চিত্রকল্পে, অনুষঙ্গে বা স্টাইলে সেসব অঞ্চলের আলো ছায়া রোদ। কলকাতা যেহেতু বঙ্গ সংস্কৃতির পীঠস্থান তাই কোনো কোনো আঞ্চলিক কবি সাহিত্যিক ইচ্ছে করে কলকাতায় জীবনবোধ,

পারিপার্শ্বিকতা বা অভিজ্ঞতা আঞ্চলিক পত্রপত্রিকায় আমদানি করেন। সে সব ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই শব্দব্যবহার, চিত্রকল্প, ডিকশন বা ভাবরাজ্যে দেখা দেয় কৃত্রিমতা—কবিতা বা সাহিত্যের আত্মা ও শরীর হয়ে ওঠে প্রাণহীনতার বাহন—নিষ্প্রাণ পাথুরে রাজ্য। ফলত কবিতা হয়ে ওঠে সাজানো কথা—গল্প হয়ে ওঠে কলকাকলি মুখর, যথার্থ সাহিত্যের হয় না জন্ম।

বিভিন্ন অঞ্চলে এমন সব পত্রপত্রিকাও আছে যেগুলো কলকাতার পত্র পত্রিকার অন্ধ অনুসারী—কলকাতার ভালোমন্দ কবিতাগল্পই যেগুলোর পুঁজি বা মূলধন; —আঞ্চলিক গল্প কবিতার প্রতি অনুদার মনোভাব বা ইচ্ছাকৃত অবজ্ঞা। এসব পত্রপত্রিকার রকমসকম এই আঞ্চলিক পত্রপত্রিকাগুলি একান্তাই গেঁয়ো—টেকনিক বা ভাবগত দিক থেকে এগুলো নিতান্ত-ই অর্বাচীন বা অনাধুনিক। এ ধরনের অজুহাতে অর্থাৎ ভ্রান্ত কলকাতা প্রীতির নামে অথবা আঞ্চলিক গল্প কবিতা বাংলা সাহিত্যের মূল ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে এ রকমের উদ্ভট ধারণা পোষণ করে এ সব পত্রপত্রিকা থেকে আঞ্চলিক কবি সাহিত্যিক যথার্থ সাহিত্যকর্মের অধিকারী হয়েও হচ্ছেন বঞ্চিত। এসব পত্রপত্রিকায় কলকাতার গল্প কবিতা প্রকাশ হতে কারও আপত্তি বা অমত থাকতে পারে না—থাকা উচিতও নয়; —তবে কথা হচ্ছে এই কলকাতার কবি সাহিত্যিকের আত্মপ্রকাশ করার জন্য আছে অজস্র পত্রপত্রিকা অথচ মফস্‌সলের কবি সাহিত্যিককে আত্মপ্রকাশ করতে বিশেষ করে সহায়ক আঞ্চলিক পত্রপত্রিকা। বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তর স্বার্থে মফস্‌সলের কবি সাহিত্যিককেও (সত্যিই যারা ভালো লিখছেন এঁদেরকে) এসব পত্রপত্রিকার মাধ্যমে সাহিত্যের বিস্তৃত জগতে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই সত্যিকারের সাহিত্য প্রীতি বা সাহিত্যসেবা। কারণ, শুধু কলকাতার লেখক নিয়েই নয় সাম্প্রতিককালের বাংলা সাহিত্য সেখানে আঞ্চলিক পত্রপত্রিকারও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। অজস্র নদীর জলে যেমন সমুদ্র গড়ে উঠে বঙ্গসংস্কৃতিরও রাজধানী কলকাতাও তেমন বিভিন্ন অঞ্চলের কবি সাহিত্যিকের অবদানেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে—তাই শুধু কলকাতা নিয়েই নয় কলকাতার সাংস্কৃতিক বা শৈল্পিক জগৎ—সমস্ত বাঙালির জাতির সাংস্কৃতিক বা শৈল্পিক মেধা ধী দিয়েই রচিত কলকাতার ঐতিহ্য।

সত্যিই কি আঞ্চলিক পত্রপত্রিকা বাংলা সাহিত্যের মূলধারা থেকে বিচ্যুত এবং তা কি সম্ভব? না, তা একান্তভাবেই অসম্ভব এবং ভীষণভাবে হাস্যকর। কারণ, আঞ্চলিক কবি সাহিত্যিকরা বাঙালি, বাংলা তাঁদের মাতৃভাষা এবং অনেকেই চর্যাপদ থেকে সাম্প্রতিককালের গল্প কবিতার গতি প্রকৃতি বা ধারাবাহিকতা অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের ট্রেডিশন সম্পর্কে সবিশেষ ওয়াকিবহাল। তাই আঞ্চলিক সাহিত্য বাংলা ভাষার মূল ধারা থেকে ছিটকে পড়া অদ্ভুত বা উদ্ভট একটা কিছু এ ধরনের ধারণার কোনো মানে হয় না—তা একান্তভাবেই অমূলক—অযৌক্তিক বা ইচ্ছা প্রণোদিত প্রতিক্রিয়াশীলতা।

আঞ্চলিক সাহিত্য আজব কিছু নয়, একান্তভাবেই বাংলা সাহিত্য—বঙ্গ সংস্কৃতির রসেই তো সঞ্জীবিত, বাঙালি হৃদয়ের ধ্যানধারণারই ত একান্ত প্রতিফলন—বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতির সঙ্গেই তো একাত্ম অভিন্ন। বাংলা সাহিত্যের গতি তার গতি—বাংলা সাহিত্যের প্রকৃতিই তার প্রকৃতি।

আসলে আঞ্চলিক সাহিত্য বা কলকাতাই সাহিত্য এ রকম কোনও উদ্ভট অভিধায় চিহ্নিত করা যায় না আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে। বাংলা সাহিত্য আঞ্চলিক নয়—কলকাতাই নয় বাংলা সাহিত্য-ই। আঞ্চলিকতা নয়—কলকাতামনস্কতা নয়, সাহিত্য নিখুঁতভাবে সাহিত্য-ই। তাই, একজন কবি বা সাহিত্যিক আঞ্চলিক না, কলকাতাই বড় কথা নয় কতটুকু সাহিত্যিক বা কবি এটাই বড় কথা। অর্থাৎ একজন সাহিত্যসেবী বাংলা সাহিত্যকে কতটুকু উন্নীত করলেন, তাঁর লেখার স্টাইল নতুন না পুরোনো, সাহিত্যে তার ব্যক্তিত্ব স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল কিনা তা-ই সবচেয়ে বড়কথা, কারণ, এ দিয়েই সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর মূল্যায়ন। তাই কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ বা শিশির ভট্টাচার্য কলকাতাবাসী না হয়ে যদি অন্য যে কোনও অঞ্চল থেকে সাহিত্যচর্চা বা কাব্যচর্চা করতেন তা হলেও বাংলা সাহিত্যে এঁদের কৃতিত্ব বা ব্যক্তিত্ব হতো একই অর্থাৎ এঁদের নিজস্বতা বা স্বাতন্ত্র্যের মাপকাঠি দিয়েই সাহিত্য ক্ষেত্রে হতো এঁদের বিচার, কলকাতাবাসী কবিসাহিত্যিক হিসাবে নয়। যেমন দীর্ঘদিন ধরে কবি বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত শিলং থেকে, মৃণাল বসুচৌধুরী শিলং ও জামসেদপুর থেকে কাব্যচর্চা করছেন, তাই বলে সাহিত্যক্ষেত্রে এঁদের স্বাতন্ত্র বা নতুনত্ব শিলংবাসী বা জামশেদপুরবাসী কবিসাহিত্যিক হিসাবে নিশ্চয় নয়, বাংলা সাহিত্যসেবী হিসাবেই। অর্থাৎ বাংলা কবিতাকে এঁরা যে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছেন—নিজস্ব ব্যক্তিত্বের যে ঔজ্জ্বল্য দিয়েছেন তাই দিয়েই সাহিত্যক্ষেত্রে হচ্ছে এঁদের মূল্যায়ন। তাই অন্ধ কলকাতাপ্রীতি বা আঞ্চলিকতা নয়, সাহিত্যকৃতিই একজন সাহিত্যিক বুঝার একমাত্র মাপকাঠি। সাহিত্য মানে আঞ্চলিকতা বা কলকাতা বাতিকতার বিজ্ঞাপন নয়, সাহিত্য মানে যথার্থ অর্থেই সাহিত্য।

পাহাড়িয়া
শারদীয়া সাহিত্য সংকলন, ১৩৮১ বাং (১৯৭৪)
দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংকলন
সম্পাদক : পীযূষ ধর, শিলং-২

ভূমিকা

আধুনিক অসমীয়া কবিতা

(চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাটের দশক)

এক

বিংশ শতাব্দীর কবিতার দুটি ধারা, একটি প্রতীকী অন্যটি আধুনিক। এই দু'টি ধারাই মূলত উনিশ শতকী রোমান্টিক উচ্ছ্বাস-বিরোধী। আধুনিক বাংলা কবিতা, অসমীয়া কবিতা, বা অন্যান্য ভারতীয় ভাষার আধুনিক কবিতা এই দুটি ধারাশ্রয়ী; আর দু'টি ধারাই ভারতীয় সাহিত্যে পাশ্চাত্যের দান।

আধুনিক ধারার কবিতায় তীব্র প্রবল প্রাত্যহিকের উপস্থিতি, সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতিধ্বনি; অর্থাৎ আধুনিক ধারা তীব্র সমাজ চেতনায় বিধৃত। প্রতীকী ধারার কবিতায় স্মৃতি-ধৃত অভিজ্ঞতা চিত্রকল্পে (যা কিনা কবিতার প্রাণ) বাণীবদ্ধ হয়ে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় প্রকাশ পায়; সাধারণত জীবনরহস্য ও সৌন্দর্য সম্পর্কে ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রতীকী প্রকাশ, নান্দনিক রহস্যময়তার কাছে আত্মসমর্পণ, ধর্মীয় নিষ্ঠাসহকারে শৈল্পিক সৌন্দর্য সাধনা, এমন কি ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির স্বেচ্ছা বিপর্যয় প্রতীকী ধারার কবিতার বৈশিষ্ট্য। তবে আধুনিক ধারা ও প্রতীকী ধারা পরস্পর সম্পৃক্ত। বোদলেয়ার প্রতীকী হয়েও আধুনিক, কোন-কোন বাঙালী কবি আধুনিক হয়েও প্রতীকী, কোনো-কোনো অসমীয়া কবি প্রতীকী হয়েও আধুনিক। আধুনিক মানসিকতা—কলাকুশলতা দু'টি ধারারই অন্বিষ্ট।

আধুনিক কবিরা সমাজ-সচেতন—বস্তুতান্ত্রিক—অন্তর্মুখী চিন্তার বাহক—উপলব্ধিজাত আন্তর সত্যের প্রকাশক—রামধনু রঙ রোমান্টিকতা-বিরোধী। অনিকেত মনোভাব, নৈরাশ্য ও ক্লান্তি, সংশয়দ্বিধা আর অন্তর্দ্বন্দ্ব আধুনিক কবিতার উপজীব্য। শহুরে জীবন প্রতিফলিত আজকের কবিতায়; নির্জনতা, বিষাদ, বিতৃষ্ণা, নির্বেদ, নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতা আর দুঃখবোধ তার আত্মাজুড়ে, —আর এ সবই সভ্যতা-সৃষ্ট সমাজ ব্যবস্থার অবদান। ১৮৫৭এ 'ফ্ল্যর দ্যু মাল' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই রঙ-বেরঙ রোমান্টিকতার স্বপ্নলোক থেকে বেরিয়ে এসে 'এক সত্য দেবতা'র পায় অঞ্জলি দিচ্ছেন বিশ্বের কবিরা। দুঃখী, পাপী, রুগ্ন, মুমূর্ষু আর অমৃতাভিলাষী মানুষের আত্মোপলব্ধির অভিজ্ঞানে দীপ্ত বিংশ শতাব্দীর কবিতা।

বিশ্বকে তদগত দৃষ্টিতে দেখেন আধুনিক কবিরা। অন্তর্বীক্ষা, আত্মচেতনা, আর আবেগ-তীব্রতা তাঁদের স্বধর্ম; ঐতিহ্যচেতনা, কালচেতনা তাঁদের মর্মমূলে। বস্তু বা ঘটনার

বহিরঙ্গ নয়, অন্তরঙ্গ রূপ—অর্থাৎ বস্তু বা ঘটনার অন্তরের সত্য ভাষন আজকের কবিতা। কবিতার উৎস জীবন—জীবনের ভাষ্যকার আধুনিক কবি। বিশ্বচেতনা স্বয়ংক্রিয় আজকের কবিতায়। বিষয়ের আত্মতায় সুনির্দিষ্ট চরিত্র নিয়ে আজকের কবিতা কড়া নাড়ে—অকপটতা, অবৈকল্য তার বক্ষজুড়ে। সুন্দর অসুন্দর আজকের কবিতায় তুল্যমূল্য।

আধুনিক কবিতায় মগ্নচৈতন্যের যথেষ্ট প্রভাব—ইম্প্রেশনিজম, এক্সপ্রেশনিজম, আর এগজিস্টেনশিয়ালিজমের প্রভাবও অনস্বীকার্য। আবেগ ও মননের সমাহৃতি, পরিমিত মাত্রায় রোমান্টিকতা, এমন কি ক্লাসিক ধারারও অনুবর্তন হয়ে থাকে আজকের কবিতায়।

আধুনিক কবিতার ভাষা সাধারণত অলঙ্কারহীন নিরাভরণ, চলিত বাগ্‌ধারাকেই আশ্রয় করে প্রধানত নির্মিত তার বাক্; কবিতার ভাষা যেহেতু কবিতার আত্মারই ভাষা, তাই বাকরীতি ও কাব্যরীতির সংমিশ্রণও হয়ে থাকে আজকের কবিতায়। চিত্রকল্প আর প্রতীকে নির্মিত আধুনিক কবিতার ভাষা। প্রাবন্ধিক ভাষা নয়, মিত কথন আধুনিক কবির অন্বিষ্ট; আর উপযুক্ত শব্দ-বিন্যাসের মধ্য দিয়ে তা সার্থক হয়ে ওঠে কবিতায়। আধুনিক কবিতায় সঙ্গীতের প্রাধান্য নেই, শব্দের গভীর অর্থ আবিষ্কারের দিকেই তার ঝোঁক। প্রতিটি শব্দ, ধ্বনি, ছোটো বড় পংক্তি, পংক্তিবিন্যাস, পংক্তির মাঝখানকার ফাঁক, অথবা ডটস, এমন কি যতিচিহ্ন ও খুব তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে আজকের কবিতায়। আজকের কবিরা ভাষার পুনর্নির্মাণে মগ্ন—কাব্যের ইতিহাস যেহেতু টেকনিকের ইতিহাস, তাই ভাষার সীমাবদ্ধতা ব্যাকরণের নিয়মাবলী—কবিতার কানুন বার বার ভাঙছেন আজকের কবিরা।

প্রথম কণ্ঠস্বরের প্রাধান্য আজকের কবিতায়। বিশ্বের প্রায় সব বিখ্যাত কবির রচনায় প্রথম কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত। প্রথম কণ্ঠস্বর কবির অন্তর্বাসীরই স্বর, অন্তরতমেরই উচ্চারিত বাণী আর তা সাঙ্গীতিক আবেগে, চিত্রকল্প প্রতীকে ধ্বনি ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় কবিতায়।

আধুনিক কবিতা প্রধানত গদ্য কবিতা। এক অন্তর্গত ছন্দ-যতিতে লেখা হয়ে থাকে; অর্থাৎ তার এক আন্তর সঙ্গীত ও নিহিত ভঙ্গিমা আছে। গদ্যস্পন্দ বা মুক্তক-বন্ধে আধুনিক কবিরা লেখেন। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, উইট, বিরোধাভাস, শ্লেষ, স্বভাবোক্তি ইত্যাদিও যথার্থ কাব্যিক ব্যঞ্জনায় অথবা বাচ্যাতীতের বৈদ্যুতিকস্পর্শে প্রকাশ পায় আজকের কবিতায়।

কবিতা অনুভবেরই ভাষা—আধুনিক কবিতার ভাষাও অনুভব-জাত। ধ্বনির মাধ্যমে অনির্বচনীয়কে আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশ করে কবিতা। বিশেষ পদ্ধতিতে শব্দ বিন্যাস করে কল্পনা বা অনুভূতির ছবি আঁকেন কবিরা। প্রধানত বোধ, গৌণত বুদ্ধির ভূমিকা ক্রিয়াশীল কবিতায়। আর কবিতা যখন প্রতীক চিত্রকল্প ইত্যাদির মাধ্যমে বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে, যুক্তি নির্ভরতা ছাপিয়ে ব্যাঙ্গার্থে পৌঁছায় অর্থাৎ তীব্রতম ব্যঞ্জনা বা একাধিক অর্থের দ্যোতনা করে তখনই কবিতা মুক্তির ভাষা— অনির্বচনীয়ের দীপশিখা, তখনই কবিতার ভাব ও ভাষায় আসে নৈর্ব্যক্তিকতা, কবিতা হয়ে ওঠে অমৃতস্পৃষ্ট।

কবিতার প্রদান কাজ আনন্দদান। ভাষাকেও সৌন্দর্যদান করে কবিতা। কখনও কখনও নতুন অভিজ্ঞতার জন্ম দেয় কবিতা, কখনও পরিচিত বস্তু সম্বন্ধে নতুন ধারণা জন্মায় অথবা ভাষার অতীত কোনও অভিজ্ঞতার স্বাদ এনে দেয়।

আধুনিক কবিতার গতি প্রকৃতি, তার আত্মা ও আঙ্গিক প্রায় সব দেশের সাহিত্যেই এক; বাংলা, অসমীয়া ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার কবিতার গতি প্রকৃতি, রূপরেখাও প্রায় এক ও অভিন্ন। তবে স্থান, কাল, পাত্র সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য-ভেদে পরিবেশের পরিবর্তনে সব বস্তুই অভিনব হয়ে ওঠে; বাংলা, অসমীয়া ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার কবিতাও স্থান, কাল, ব্যক্তি আর ঐতিহ্যের প্রভেদে অভিনব। আর এই অভিনবত্বই যে কোনও সাহিত্যের স্বকীয়তা।

দুই

চল্লিশের নতুন 'জয়ন্তী' পত্রিকার কবিগোষ্ঠী অসমীয়া কবিতাকে নতুন সাজসজ্জায় ভূষিত করেন— তখন থেকেই অসমীয়া কবিতা আধুনিকতার দিকে পদ সঞ্চালন করে। সাহিত্য পত্রিকা 'জয়ন্তী'র কবি গোষ্ঠীই অসমীয়া কবিতায় নিয়ে আসেন নতুন ভাবনা, নতুন আঙ্গিক; ভাব ও রূপের ক্ষেত্রে নিয়ে আসেন নতুনত্ব। ভাবের দিক থেকে পূববর্তী কবিদের প্রেমানুভূতি, সৌন্দর্যপ্রীতি, রোমান্টিক উচ্ছ্বাস পরিহার করে সমাজ-চেতনা বা প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা, সভ্যতার সংকট বা তার অবক্ষয়জনিত রূপের প্রকাশ এই সময়ের কবিতার বৈশিষ্ট্য; আঙ্গিকের দিক থেকে গদ্য-গান্ধী শব্দ, মুক্তক ছন্দবন্ধ, স্পন্দিত গদ্যের ব্যবহারও এই সময়ের সাধারণ লক্ষণ। কবিত্রয় অমূল্য বরুয়া, ভবানন্দ দত্ত ও হেম বরুয়ার উদ্যোগেই অসমীয়া কবিতায় আধুনিকতার শুভারম্ভ। চল্লিশের দশকে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রয়াত কবি অমূল্য বরুয়াই অসমীয়া কবিতায় আধুনিকতার প্রথম উদ্বোধক। তাঁর 'অন্ধকারের হাহাকার', 'বেশ্যা'; ভবানন্দ দত্তের 'রাজপথ' ও হেম বরুয়ার 'বাঁদর' ভাব ও আঙ্গিকের কি থেকে অসমীয়া কবিতায় আধুনিকতার দিশারী। চল্লিশের অসমীয়া কবিতার ভাষা ও ভাবের ভুবণে নতুনত্ব এলেও বেশির ভাগ কবিতাই রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেনি।

চল্লিশের দশকে কবি নবকান্ত বরুয়া আর্বিভূত হন। পঞ্চাশের দশকে লেখা কবিতাগুলিই তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, জিজ্ঞাসা ও কাব্যশৈলীর বৈশিষ্ট্যে স্বাক্ষরিত। এ সময়েই বেশ কিছু সার্থক কবিতা রচনা করে নবকান্ত বরুয়া অসমীয়া সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান করে নেন। প্রধানত 'পলি', 'এইখানে নদী ছিল', 'অন্ধকার রাতের এলিজি', 'সনিমন্ত্রিত', প্রভৃতি কবিতাতেই তাঁর প্রতিভা দীপিত হয়ে ওঠে। 'অন্ধকার রাতের এলিজি' ও 'এইখানে নদী ছিল'— এই দু'টি কবিতার ভাবগত পরিমণ্ডলও বেশ বিস্তৃত। 'পলি', মনে কি পড়ে না অরুন্ধতী, 'সনিমন্ত্রিত' নিরলঙ্কার, মিত কথনে রচিত আধুনিক কবিতা। তিনি যুগসন্ধির কবি। অসমীয়া সাহিত্যে রোমান্টিকতার শেষ পর্যায় আর আধুনিকতার মাঝখানে তিনি সেতুস্বরূপ। তাঁর কবিতা চারিত্র্যগুণে ও স্টাইলের দিক থেকেও রোমান্টিকতা ও আধুনিকতার মিলন ক্ষেত্র।

নবকান্ত ঐতিহ্য-সচেতন কবি। কলং কপিলী দিজু নদী থেকে মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র তার কবিতায় প্রবাহিত। দেওধনি থেকে সাঁওতালী নাচ ঢেউ খেলে তাঁর কবিতায়। তাঁর বহু কবিতায় আসামের প্রকৃতি চিত্রিত— বৃহত্তর ভারতীয় ঐতিহ্য মুদ্রিত। তাঁর কবিতা চিত্রধর্মী, কথ্যভাষা নির্ভর, নাটকীয় গতিবেগ তাঁর কবিতায় ক্রিয়ারত। তিনি প্রধানত মাত্রাবৃত্ত বা মিশ্র কলাবৃত্তে ছন্দে লেখেন। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু মূল্যবোধের সংকট, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, বুদ্ধি- অনুভূতির দ্বন্দ্ব, কালচেতনা, রাষ্ট্রচিন্তা ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ ও ওয়েস্টল্যান্ডের ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েও তাঁর কবিতা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে দীপ্যমান। তাঁর অসামান্য কবিত্বই তাঁকে অসমীয়া সাহিত্যে অসাধারণ করে তুলেছে। টেকনিকের মায়াবিস্তার নয়, কবিত্বের ইন্দ্রজালই কবির গৌরব-মুকুট। 'পলি' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। তাঁর কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতা : 'এইখানে নদী ছিল', 'অন্ধকার রাতের এলিজি', 'সম্রাট' (প্রথম অংশ), 'সনিমন্ত্রিত' ইত্যাদি। আধুনিক অসমীয়া কবিতার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে নবকান্ত বরুয়ার অবদান অনেক। আধুনিক পাশ্চাত্য কবিতার ভাব ও রূপের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য। এই সমন্বয়মুখী চিন্তাধারা থেকেই অসমীয়া কবিতায় এসেছে নতুন শৈলী, নতুন ভঙ্গি, নতুন চিত্রকল্প, অভিনব ছন্দ।

চল্লিশের দশকে অজিত বরুয়া আত্মপ্রকাশ করেন। পঞ্চাশের দশকে নীরবে থেকে ষাট ও সত্তরের দশকে পুনর্বার আবির্ভূত হন। ১৯৪৮ সালে কলকাতায় বসে লেখা তার 'মন-কুয়াশা-সময়' অসমীয়া সাহিত্যের প্রথম সার্থকতম আধুনিক কবিতা। এবং তিনিই যথার্থ অর্থে অসমীয়া সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবি। তিনি প্রকরণ কুশলী কবি (এমনি প্রকরণ নিপুণ যে তাঁকে সীমিত অর্থে অসমীয়া সাহিত্যের ভারতচন্দ্র অ্যাখ্যা দেওয়াই শ্রেয়।) তাঁর কবিতায় মেধা ও আবেগের সমাহার। এদিক থেকে তিনি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে তুলনীয়। আধুনিক মানসিকতা ও আঙ্গিক কুশলতা তাঁর কবিতার লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। এলিয়টের আধুনিকতার অন্তর্লোকে প্রবেশ করেই তিনি অসমীয়া লোকগীতির ভাষা— এমনকি শঙ্করীয় ঐতিহ্যের ভাষাকেও কবিতায় ব্যবহার করে কথ্য ভাষা নির্ভর নিজস্ব কাব্য-ভাষা নিমার্ণ করেছেন। প্রধানত গদ্য ছন্দে, কথ্য ভাষায় তিনি কবিতা রচনা করেন। চিত্রকল্প ও প্রতীক তাঁর কবিতায় ভাস্বর। তাঁর কবিতার আবেদন প্রধানত মেধায়, গৌণত হৃদয়ে।

অজিত বরুয়া সাধারণত জটিল অনুভূতিকে কাব্য-রূপ দেন। তাই সব সময় তাঁর ভাষা ব্যাকরণ-সম্মত হয় না— নিজস্ব ভঙ্গিতে শব্দ-বিন্যাস করে তাঁর জটিল ভাবানুভূতির আভাস দেন। চেতনার বিভিন্ন স্তরে তাঁর অভিজ্ঞতা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে কাব্য-রূপ পায়। তাই তাঁর কবিতা আপাত অসংলগ্ন প্রতীকী চিত্রে ভরপুর। 'জেংরাই ১৯৬৩' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। এই কবিতাটি জাগ্রত ও সুপ্ত, চেতন ও অচেতন পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে একটি বিশেষ স্থানে রাত্রি যাপনের অভিজ্ঞতা। বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সর্বগ্রাসী ভয়, মৃত্যু অথবা রূপকথার জগতে আশ্রয় নেওয়ার অবচেতন বাসনা বাণীরূপ পেয়েছে কবিতাটিতে।

আর সব শেষে জীবনকে একটি স্বপ্নের মতো উপলব্ধি করে সমাপ্ত হয়েছে কবিতাটি। এইসব মিশ্র জটিল অনুভূতির কাব্য-রূপ কবিতাটি। তাঁর কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতা: 'মন-কুয়াশা-সময়', 'হঠাৎ নিঃসঙ্গ এক দমকা হাওয়া', 'অবন্তী নগর', 'একজোড়া তামার কুশি', 'মন-দেয়া নদী' ইত্যাদি।

অজিত বরুয়া নিঃসন্দেহে অসমীয়া সাহিত্যের একজন সার্থক কবি তার নির্মিত কাব্যভাষা অসমীয়া সাহিত্যে অভিনব আর যেহেতু অভিনব তাঁর কাব্যভাষা তাই কবি হিসাবে দীর্ঘায়ু তাঁর প্রাপ্য।

মহিম বরা, হরি বরকাকতি, হোমেন বরগোহাঞি ও বীরেশ্বর বরুয়া পঞ্চাশের খ্যাতিমান কবি।

মহিম বরার কবিতা চিত্রকল্প ও প্রতীকে দীপ্ত। তাঁর কবিতা চিত্র প্রধান, সঙ্গীতধর্মী। তাঁর ছোটো গল্পের মতোই তাঁর কবিতায়ও লিরিকাল আবেগের অনুরণন। তিনি আসামের প্রকৃতি ও রূপকথা থেকে চিত্রকল্প চয়ন করে প্রাণের রঙে তাঁর ছোট্ট কাব্যসংসার সাজিয়ে তোলেন। তাঁর কাব্য সংসারে কাদাখোঁচার লেজে সময় কম্পন তোলে, বর্ষণে উদ্বেল হয়ে ওঠে পুকুর, উড়ে বেড়ায় প্রাণচঞ্চল ফড়িঙের দল। ফুল কুমারী, কমলা কুমারী আর তেজিমলার স্মৃতি বিষণ্ণতার আবেশ আনে।

সীমাবদ্ধ তাঁর উপলব্ধির জগৎ, ধ্বংস, ক্ষয়, স্বপ্নভঙ্গ-জনিত দীর্ঘশ্বাস, আর অমর অক্ষয় জীবনের ক্ষণিক জ্বলে ওঠা দীপশিখার মতোই সীমিত তাঁর জগৎ। তাঁর স্মরণীয় কবিতা: 'মাছ', 'রাঙা ফড়িঙ', 'ভরলী পারের বিকেল', এবং 'শিলাবৃষ্টির পর উষায়'। 'মাছ' চিরন্তন কামনা আর সৃষ্টির প্রতীক, ছন্দায়িত জীবন আর অক্ষয় সৃষ্টির মূর্ত প্রতীক মাছ'। কাব্যিক ব্যঞ্জনায় কিছু বিমূর্ত ভাব রূপ পেয়েছে 'ভরালী পারের বিকেল'- এ। 'রাঙাফড়িঙ' কবিতাটি রোমান্টিক চেতনায় দীপ্ত— প্রধানত স্মৃতি ও মানুষের মধ্যেকার দূরত্বের 'effect' কবিতাটিতে প্রকাশিত। 'শিলাবৃষ্টির পর উষায়' সাংকেতিক ভাষায় ধ্বংসের পর জীবনের গান।

মহিম বরার কবিতা কিছু পরিমাণে জীবনানন্দীয় অনুষঙ্গে আক্রান্ত।

হরি বরকাকতি জীবন-সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ান, ঘোড়ার ক্ষুরের দাগে বন্ধুর জীবনপথ দিয়ে চলেন। তাঁর স্মরণীয় কবিতা 'বলাকা', 'অনুর্বরা'। রোমান্টিকতার শেষ রশ্মিপাতে তাঁর কবিতা কিছুটা বর্ণাঢ্য। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কিছু পরিমাণে সিনিকাল। প্রধানত মুক্তক-বন্ধে, মিশ্রকলাবৃত্তে ছন্দে তিনি লেখেন। সাবলীলতা— গতিময়তা তাঁর কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

হোমেন বরগোহাঞির কবিতায় পাশ্চাত্য চিন্তাধারা, ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে-র ঈষৎ প্রভাব। তিনি সাধারণত মুক্তক-ছন্দে, মিশ্রকলাবৃত্তে বা গদ্য ছন্দে লেখেন।

বরগোহাঞির কোনও-কোনও কবিতার ভাষায় আধুনিকতা কিছুটা ম্লান। তাঁর কবিতায় প্রধানত মৃত্যু-বাসনা, অন্ধকার-প্রীতি, রহস্যময় মনোজগৎ, নস্টালজিয়া আর নিঃসঙ্গতার পক্ষবিধূনন। তাঁর কবিতায় প্রতীক চিত্রকল্প, দুই-ই পাওয়া যায়।

বীরেশ্বর বরুয়ার 'লিলির বিকেল' অসমীয়া সাহিত্যের বিখ্যাত কবিতা। প্রতীকী ভাষায় রচিত এই কবিতাটিতে একটি বিকেলের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। হতাশা আর কারুণ্যের সুরে

কবিতাটি সহৃদয়-হৃদয়সংবাদী। তাঁর 'একটি বিমান দুর্ঘটনার পর' ও 'ডাহুকী' উঁচু মানের কবিতা। তিনি গদ্য ছন্দে, কথ্য ভাষায় লেখেন, সুন্দর চিত্রকল্প ব্যবহার করেন। কালচেতনা, আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব, যন্ত্রণাকাতর অথচ স্বপ্নমুগ্ধ একটি সুর তাঁর কবিতায় অনুরণিত। তাঁর কবিতার সৌন্দর্য পংক্তিতে পংক্তিতে নয়, বা বিশেষ কোনও চিত্রকল্পেও নয়, আস্ত কবিতায়।

ষাটের দশক অসমীয়া কবিতার ভুবনে উজ্জ্বল সময়। এই সময়েই আধুনিক অসমীয়া কবিতার প্রধান পুরুষ নীলমণি ফুকন কবিতার সন্ধানে বিশ্বপর্যটনে বেরিয়ে পড়েন; আর এই সময়েরই প্রধান কবি ভবেন বরুয়া, হীরেন ভট্টাচার্য, নির্মলপ্রভা বরদলৈ ও হরেকৃষ্ণ ডেকা। এই সময় সীমার মধ্যেই অসমীয়া কবিতার ভাষা, ভাব আর রূপের ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে আধুনিকতা পরিলক্ষিত হয়। এই সময়েই এক দশকেরও অধিককাল নীরবতার পর অজিত বরুয়া তাঁর 'জেংরাই ১৯৬৩' এই গুরুত্বপূর্ণ কবিতাটি লিখে পুনর্বার আত্মপ্রকাশ করেন। এই সময়েই অসমীয়া কবিতায় 'মুখ্যত ইংরেজী' 'কখনো বাংলা ভাষা'র মাধ্যমে আন্তর্জাতিক কাব্যচিন্তার প্রভাব পড়ে; বিশ্ব-কবিতার সঙ্গে অসমীয়া কবিদের অন্তরঙ্গ পরিচয় হয়। আর এই সময়েই অসমীয়া কবিতা প্রতীক- চিত্রকল্পের সুষমায় উজ্জ্বলতর হয়ে, নিজস্ব ঐতিহ্যের পথ ধরে রস-গঙ্গোত্রীর দিকে যাত্রা আরম্ভ করে। জাপানী, চীনা কবিতার অনুবাদ এই সময়েরই ঘটনা।

নীলমণি ফুকন আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর চিত্রকল্প আবেদনে অভিভূত করে; তাঁর প্রতীক ব্যবহারও মনোহর। তাঁর প্রথম দিকের কবিতায় নির্জনতার প্রতিধ্বনি; সাম্প্রতিক কবিতা সমাজ-চেতনায় দীপ্র। তাঁর নির্জনবোধ এসেছে এই শতাব্দীর ভয়ঙ্কর ব্যাধি বিচ্ছিন্নতা থেকে, সমাজ- চেতনা এসেছে দুস্থ দুঃখী অসহায় মানুষের আর্তনাদ থেকে। তিনি ঐতিহ্য-সচেতন কবি। তাঁর কবিতায় অসমীয়া তথা বৃহত্তর ভারতীয় ঐতিহ্য অন্তঃশীলা। আসামের প্রকৃতি তাঁর কবিতার প্রায় সর্বত্র ছায়া বিস্তার করে আছে; তার নদ-নদী, বিচিত্র ঘাসাগাছ, বনবনানী আর পক্ষীকুল প্রতীক আর চিত্রকল্প হয়ে আলাপচারী। গদ্যভঙ্গিতে এক অন্তর্গত ছন্দে তিনি কথা বলেন— যে কোনও সচেতন পাঠক বা রসিকজন উৎকর্ণ হয়ে শোনেন তাঁর কণ্ঠস্বর।

তাঁর কবিতায় প্রথম কণ্ঠস্বরের প্রাধান্য। কবিতাগুলো প্রধানত চিত্রধর্মী, সাঙ্গীতিক স্বাদুতায় অনন্য— ভাস্কর্যে নিটোল। অভিনব তাঁর প্রকাশ-ভঙ্গি। আধুনিক মানসিকতা ব্যক্ত তাঁর কবিতায়। ব্যঞ্জনাধর্মী ও বহুমাত্রিক তাঁর কবিতা। বস্তু বা ঘটনার আন্তর সত্যের দিকেই নীলমণির দৃষ্টি, তাই তাঁর বহু কবিতা গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। প্রাত্যহিক জীবন আর সামাজিক বাস্তবতা থেকে উঠে আসে তাঁর কবিতা। তাঁর কবিতার প্রধান উপজীব্য প্রকৃতি, নারী, মৃত্যু, নিঃসঙ্গতা-বিষাদ-যন্ত্রণা, মানবজীবন তথা বিশ্বচরাচরের অন্তিম রহস্য।

নীলমণি বহু উৎকৃষ্ট কবিতার স্রষ্টা।... "গত একশো বছরের অসমীয়া কবিদের প্রথম সারিতেই তাঁর স্থান।" কেউ কেউ মনে করেন তিনি অসমীয়া সাহিত্যে জীবনানন্দের ধারার কবি। আমার মনে হয় বিশ্ব কবিতার ঐতিহ্য স্বীকরণ করে তিনি একজন অসামান্য কবি। চীনা, জাপানী কবিতা ও লোরকার কবিতার খ্যাতকীর্তি অনুবাদক-কবিও তিনি।

ভবেন বরুয়া আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক। তাঁর কাব্য সমালোচনা যুক্তিযুক্ত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। তিনি আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের বিশিষ্ট মননশীল কবি। আবেগ ও মননের যুক্তবর্ণ তাঁর কবিতা। নান্দনিক চেতনা, কবিতার কারুকলা সম্পর্কে সচেতন মনোভাব এবং সমালোচক সত্তা তাঁর কবিতার নির্মাণ-কর্মে সহায়ক। কামনা-বাসনা সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতা সুক্ষ্মভাবে ব্যক্ত তাঁর কবিতায়। তাঁর কবিতা ব্যঞ্জনাধর্মী- অনেক কবিতা একাধিক অর্থযুক্ত। তিনি প্রকরণ কুশলী কবি। প্রতীক ও চিত্রকল্প তাঁর কবিতার সৌন্দর্য। নিটোল, ঘনপিনদ্ধ তাঁর কবিতা। মিত কথন তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য। শব্দ বিন্যাসে কোথাও কোথাও তিনি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত।

ভবেন বরুয়ার কবিতা অসমীয়া তথা বৃহত্তর ভারতীয় ঐতিহ্য চেতনায় দীপ্ত। তিনি বেশ কিছু উৎকৃষ্ট কবিতার জন্মদাতা। তাঁর কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতা: 'সোনালি জাহাজ', 'শুভ্রতার স্বর', 'শব্দাবলী', 'ঠিক সন্ধ্যা বেলা', 'ভাঙা ঘুমের স্বর', 'ঝড়ের প্রান্তে', 'চির-উজাগর নীল' ইত্যাদি।

হীরেণ ভট্টাচার্যের কবিতা আন্তরিক মানব-প্রেম ও স্বতঃস্ফূর্ত সমাজ-চেতনায় স্পন্দিত। তিনি কিছু পরিমাণে রোমান্টিক চেতনায়ও অনুপ্রাণিত। আসামের প্রকৃতি ষোড়শী-মূর্তি ধরে আবির্ভূত তাঁর কবিতায়। তাঁর কবিতা সঙ্গীত ধর্মী, চিত্র-প্রধান; গদ্য-ভঙ্গিমায় তিনি কথা বলেন, সুন্দর চিত্রকল্প তিনি ব্যবহার করেন। তাঁর কবিতা নিটোল। তৎসম, তদ্ভব শব্দ আর বিশুদ্ধ অসমীয়া শব্দ তাঁর কবিতায় পাশাপাশি ব্যবহৃত হয় অবলীলাক্রমে এবং শৈল্পিক সুষমায় হয়ে ওঠে আকর্ষণীয়। তাঁর হাইকু টাইপের কবিতায় শব্দের আশ্চর্য ভাস্কর্য। তাঁর প্রেমের কবিতা গভীর ব্যঞ্জনাময়।

'জোনাকি-মন' এই শিরোনামে এক থেকে ছয় পংক্তিতে লিখিত তাঁর কবিতাগুলো সংখ্যায় ৬৭ আর প্রতিটি কবিতাই 'স্বয়ং-সম্পূর্ণ'। এই কবিতাগুলোর বেশ কয়েকটি ভাবের দিক থেকে অমন গভীর, শিল্পগুণে অমন হৃদয়গ্রাহী যে গালিবের গজলের মতোই আবেদনীয়। বলা বাহুল্য, কিছু উৎকৃষ্ট কবিতা সৃষ্টির জন্য এবং 'জোনাকি-মন' এর বেশ কয়েকটি উঁচু মানের কবিতার জন্য কবি হিসাবে হীরেণ ভট্টাচার্য অসমীয়া সাহিত্যে মর্যাদা-সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব।

তিনি সবচেয়ে জনপ্রিয় অসমীয়া কবি। তাঁর কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতা: 'বাঁশির ডাক', 'ও', 'শিরায় শিরায়', 'ভোগালি', 'কাঠ-হাওয়া আশ্রুর গান', 'দুঃখ আমার কোলোর শিশু', ইত্যাদি এবং 'জোনাকি-মন' এর কিছু কবিতা।

সত্তর দশকে লেখা কবিতাগুলোই নির্মলপ্রভা বরদলৈকে অসমীয়া সাহিত্যে বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর কবিতায় সামাজিক ভাবনা-চিন্তা পক্ষ বিস্তার করে আছে। বৃহত্তর মানব সমাজের আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখের দাবিতে উন্মুখ তাঁর কবিতা। বিপ্লব না আসার জন্য তিনি সঙ্কুচিত, দ্বিধাগ্রস্ত মানুষকেই দায়ী করেছেন। তাঁর কিছু কবিতা বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মবোধের অভিজ্ঞানে উজ্জ্বল এবং অন্তিম আত্মসমপর্ণের প্রার্থনায় বেদনা মধুর; আবার কিছু-কিছু কবিতা এক ধরনের নস্টালজিক অনুভূতির সুন্দর প্রকাশ। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যতাও তাঁর কবিতার একটি বৈশিষ্ট্য। তাঁর সাম্প্রতিক কবিতা মিতবাক্, ব্যঞ্জনময়, কাব্যিক ভাবনায় আক্রান্ত। তিনি গদ্যছন্দে অথবা নিহিত ভঙ্গিমায় অর্থাৎ এক অন্তর্গত ছন্দে কবিতা লেখেন। তাঁর কবিতার আন্তর সঙ্গীত (যা কিনা মূল ভাবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকে) প্রাণিত করে। তাঁর কবিতা চিত্রপ্রধান, ভাবঘন প্রতীকী ব্যঞ্জনায় দীপ্ত, সুন্দর চিত্রকল্পে সমৃদ্ধ, তাঁর কবিতার প্রধান উপজীব্য 'অস্তিত্বের— সত্তার— আত্ম-পরিচয়ের অর্থ-মূল্য ভিত্তি, সময়-প্রবাহ, জীবনের অন্তিম নিঃসঙ্গতা, মৃত্যু-যন্ত্রণা' ইত্যাদি।

নির্মলপ্রভা আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি। তাঁর কিছু উৎকৃষ্ট কবিতা: 'অন্ধকার','দুঃখের পাহাড়', 'করুণতম', 'বৈশাখ-৩', 'বশিষ্ঠে দুপুর', 'মর্মান্তিক' ইত্যাদি।

বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, কেশব মহন্ত, হীরেন গোঁহাই ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের অন্যতম কবি। কবি প্রফুল্ল ভুঞা ও সৈয়দ আব্দুল হালিম প্রতিশ্রুতিবান। ভুঞার 'এক মানুষের প্রাণ' একটি অসাধারণ কবিতা। হালিমের 'ফুল, রক্ত আর বৃষ্টির আলয়ে সামসুদ্দীনের প্রত্যাবর্তন' একটি উঁচু মানের কবিতা। মধ্য-প্রাচ্যের আকাশ-বাতাস আর জনজীবনের স্পর্শে কবিতাটি প্রাণবন্ত। আসাম প্রকৃতি ও ভারত সংস্কৃতি উদারভাবে উন্মোচিত কবিতাটিতে। কবিতাটি ভারত ও মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে আত্মীয়তার অভিজ্ঞানস্বরূপ। দু'টি কবিতার ভাষায়ই প্রতীক ও চিত্রকল্পের প্রাধান্য।

ঔপন্যাসিক বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য সাহিত্য-ক্ষেত্রে অসমীয়া তথা সর্বভারতীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি কিছু উত্তম কবিতারও জন্মদাতা। তাঁর হাইকু টাইপের কবিতাগুলো কবিত্বে দীপ্ত, তিনি চিত্রকল্প ব্যবহার করেন, তবে অলঙ্কারহীন ভাষায় লেখা তাঁর কবিতাগুলোই প্রজ্ঞার আলোকে উজ্জ্বল।

কেশব মহন্তের কবিতা গীতিধর্মী, সামাজিক দায়-বদ্ধতায় অঙ্গীকার-বদ্ধ। গ্রাম্য জীবন থেকে উঠে আসে তাঁর কবিতার চিত্রকল্প। তাঁর কিছু কবিতায় প্রতীক ও চিত্রকল্পের সুন্দর প্রয়োগ লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। তাঁর সাম্প্রতিক কবিতার ভঙ্গিমা গদ্যধর্মী। তাঁর দুটি উল্লেখযোগ্য কবিতা: 'খেদ', 'যাহার থাকো হে নদীর শান্ত পারে'।

হীরেন গোহাঁইর কবিতায় ক্ষয়িষ্ণু মানুষের হাহাকার প্রতিধ্বনিত। ব্যাঙ্গোক্তি আর নাটকীয় সংলাপে সামাজিক অবক্ষয়ের কথা ব্যক্ত তাঁর কবিতায়। গদ্যছন্দে, চিত্রকল্পের প্রয়োগে, ছন্দময় খণ্ডবাক্যে তাঁর কবিতা উৎরায় ভালো। 'উত্তর রবীন্দ্র', 'অক্টোবর' ও 'ষষাতি তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা'।

হীরেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষা চিত্রধর্মী। কবিতায় অনেক সময় তিনি গ্রামীণ শব্দ ব্যবহার করেন। প্রকৃতির বুক থেকে উঠে আসে তাঁর চিত্রকল্প, লোকগীতি বা রূপকথা থেকে উঠে আসে তাঁর পংক্তি। এক অপূর্ব শব্দ গন্ধ রূপ স্পর্শের সান্দ্র নিঃশ্বাসে ভরপুর তাঁর কবিতা। তাঁর কবিতায় চিত্রকল্পের যেমন প্রাচুর্য, তেমনি (কোনো কোনো কবিতায়) সঙ্গীতময়তার আতিশয্য। ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা, স্মৃতি, বিষাদ-যন্ত্রণা তাঁর কবিতার বিষয়। তাঁর উৎকৃষ্ট কবিতা: 'সোমধিরি স্মরণে' ও 'অস্তাচল'।

হরেকৃষ্ণ ডেকার কবিতায় কথ্য ভাষার নাটকীয় প্রয়োগ, নতুন প্রতীক আর মনোহর চিত্রকল্প অনায়াসে লভ্য। তাঁর কোনো-কোনো কবিতা ঘন-পিনদ্ধ, মিত ভাষণে ব্যঞ্জনাময়। তাঁর কবিতা চিত্রধর্মী, সঙ্গীত-প্রধান, মননশীলতায়ও দীপ্ত। অন্তর্গত ছন্দে গদ্য কবিতাও তিনি লেখেন।

তাঁর কবিতায় কাল-চেতনা, সভ্যতাসৃষ্ট জীবন-যন্ত্রণা, নিঃসঙ্গতাবোধ আর বাস্তবতার আনাগোনা। বিশ্বরহস্য, জীবন-জিজ্ঞাসাও অনাগত নয় তাঁর কবিতায়। তাঁর কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতা: 'জ্যোৎস্না', 'একটি দূরের ডাকে', 'আশির ভূমিকম্পের পর' ইত্যাদি।

আধুনিক অসমীয়া কবিতা নবরত্নের কারুকার্যে দীপ্তিময়। সাধারণত কবিতাগুলো অসমীয়া জীবন আর আসাম প্রকৃতির বাঙময় উদ্ভাস— যান্ত্রিক শহুরে জীবন নয়, সত্য উপলব্ধির উজ্জ্বল প্রকাশ। বহু কবিতা আপাত সরল হয়েও অনেক গভীর— স্বভাবোক্তির অন্তরালে গভীর ব্যঞ্জনাময়— আধুনিক মানসিকতার শৈল্পিক প্রকাশ। আবার অনেক কবিতা বর্ণনার অন্তরালে জটিলতার প্রতিধ্বনি— সামাজিক বাস্তবতার আন্তর কাহিনির রূপ দিতে গিয়েই অনেক কবিতার ভূ-বায়ু জটিল। তাই নিসর্গ-চেতনা বা সমাজ- চেতনা, ঐতিহ্য- চেতনা বা সৌন্দর্য-চেতনা জড়ভরতের রূপ ধারন করেনি কবিতাগুলোর কোথাও। আর আধুনিক অসমীয়া কবিতার ভাবনায় কিছুই আরোপিত নয়, আহূত নয়— সবই অর্জিত; 'সত্যমূল্য' দিয়েই আধুনিক অসমীয়া কবিতা রসিকের দুয়ারে কড়া নাড়ে— তার অনেকখানি জুড়ে অনির্বচনীয়।

বিষ্ণুপথ
রুক্মিণীগাঁও
গৌহাটি-২২

রমানাথ ভট্টাচার্য

অনুবাদ প্রসঙ্গে

১৯৭৫ সাল থেকেই আধুনিক অসমীয়া কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয়; আর এই পরিচয় দিনে-দিনে নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়। পরিচয় খুব নিবিড় হলে বুঝতে পারলুম, বহু কবিতার বাংলা ভাষান্তর প্রয়োজন। তাই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বসে বসে বহু কবিতার বাংলা ভাষান্তর করেছি। আর প্রায় সব নির্বাচিত কবিদের সঙ্গে অনুদিত কবিতা নিয়ে আলোচনায় বসেছি যাতে অনুবাদ ত্রুটি-মুক্ত হয়।

অনুবাদ সাহিত্যের দিগন্ত বিস্তৃত করে— মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে ভাব-বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে সেতুবন্ধ রচনা করে।

কবিতা অনুবাদ কষ্টসাধ্য কাজ, অনুবাদক মাত্রেই তা জানেন, সুধিবৃন্দেরও তা অজানা নয়। কবিতার যথার্থ অনুবাদ সম্ভব নয়, কারণ প্রত্যেক ভাষার বাগ্‌ধারা, ব্যকরণ-রীতি, সঙ্গীত স্বতন্ত্র; তা ছাড়া সব ভাষারই কবিতায় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, জাতীয় ঐতিহ্য অন্তঃশীলা। তাই যে-কোনো বিদেশী ভাষার কবিতা ভাষান্তরিত হলে সাধারণত মূল কবিতার ভাব, সেই কবিতায় ব্যক্ত কবির মনোভঙ্গি, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আমরা জেনে থাকি। আমাদের সাহিত্যে বুদ্ধদেব বসু শ্রেষ্ঠ অনুবাদক-কবি। কালিদাস, রিলকে, হোল্ডার্লিন ও বোদলেয়ারের কবিতা তিনি অমন উত্তম অনুবাদ করেছেন যে কবিতাগুলো একান্ত ভাবেই অনুসৃষ্টি হয়ে উঠেছে। বিষ্ণু দে অনূদিত টি. এস. এলিয়টের কবিতা, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অনূদিত মালার্মে, হাইনে, শেক্সপীয়র ও অন্যান্য অনেক বিদেশী কবির কবিতাও অনুরূপ অনুবাদ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত অনূদিত অনেক বিদেশী ভাষার কবিতাও সার্থক অনুসৃষ্টি হয়ে উঠেছে। সাধারণত কবিতার সঠিক ভাষান্তর হয় না, তাই যে ভাষায় কবিতা অনুদিত হয় অন্তত সেই ভাষায় কবিতাগুলো যাতে সার্থক কবিতা হয়ে ওঠে সে-দিকেই কবিরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। অনুদিত কবিতা অনুসৃষ্টি হয়ে উঠলে তা অভিনন্দন যোগ্য, কারণ সে ক্ষেত্রে মূল কবিতার শব্দ-গন্ধ-রূপ স্পর্শের যথেষ্ট আস্বাদ অনুদিত কবিতায় পাওয়া যায় এবং যে ভাষার অনূদিত সেই ভাষার কবিতা হিসাবেও তা সার্থক হয়ে ওঠে।

অনুবাদ একই উৎস থেকে জাত ভাষায়, সাধারণত প্রতিবেশী ভাষায় সার্থক হয়ে ওঠে। এ কারণেই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় রচিত কবিতার অনুবাদ ওই গ্রুপের বিভিন্ন ভাষায় ভালো উৎরায়; আবার নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার কবিতা ওই গ্রুপের অন্যান্য ভাষায় অনুদিত হলে সাধারণত রসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে। ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মানসিকতার নৈকট্যই তার কারণ। আর এ কারণেই আমি আমার প্রিয় কবি মনতালে,

পাবলো নেরুদা বা রবার্ট ফ্রস্টের কবিতা অনুবাদ না করে একটি নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার কিছু কবিতা ওই গ্রুপের অন্য একটি ভাষায় তর্জমা করেছি। (কারো কারো কাছে আমার উক্তিটি কৈফিয়ৎও বটে!)

মাতৃভাষার কাছাকাছি ভাষায় রচিত কবিতা ভাষান্তরিত হলে মূল কবিতার ছন্দ, ভাব, চিত্রকল্প, এমনকি কিছু-কিছু শব্দ পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় অনুবাদে এসে যেতে পারে। বাংলা, অসমীয়া ও ওড়িয়া মাগধী প্রাকৃত জাত ভাষা, প্রতিটি পরস্পর ভগ্নীভাষা— তাই যে কোনও একটি থেকে অন্যটিতে কবিতা অনূদিত হলে তা মূল কবিতার মতো আস্বাদনীয় হতে পারে।

অসমীয়া থেকে যে সব কবিতা আমি বাংলায় অনুবাদ করেছি, সে-সব কবিতা আমি বার বার আবৃত্তি করেছি, অভিনিবেশ সহকারে অনেক বার পড়েছি, ফলে মূল কবিতার ভাব, ভঙ্গিমা, সঙ্গীত, চিত্রকল্প বা প্রতীক আমার কাছে উদারভাবে উন্মোচিত হয়েছে; এমনকি মূল কবিতার আন্তর আবহাওয়া পর্যন্ত আমার অন্তর্লোকে সঞ্চারিত হয়েছে। অনুদিত কবিতায় যেসব ক্ষেত্রে যথার্থ প্রতিশব্দের অভাব হয়েছে, সে ক্ষেত্রে আমি অনুরূপ শব্দ ব্যবহার করেছি, মূল কবিতার সঙ্গীত যতদূর সম্ভব অনূদিত কবিতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি, সাম্ভাব্যস্থলে মূল কবিতার শব্দ ভাষান্তরেও অক্ষুণ্ণ রেখেছি; যেখানে দেখেছি মূল কবিতার শব্দ তৎসম হলেও বাংলা ভাষায় বেমানান বা বাংলায় শব্দটি কবিতার ভূ-বায়ু নির্মাণে নিজ ভূমিকার ক্ষেত্রে ব্যর্থ, সেখানে আমি অনুরূপ শব্দ বা বাংলায় মানান-সই সমার্থক শব্দ ব্যবহার করেছি।

অনুবাদ-কর্মে অনেক সময় বাংলা ভাষায় যথার্থ শব্দ পেতে আমার যথেষ্ট পরিশ্রম হয়েছে— আমি যথার্থ শব্দের জন্য বাংলা আর অসমীয়া অভিধান বার বার ওলট-পালট করেছি— অভিধানেরা যখন আমাকে আশ্বস্ত করতে পারেনি তখন আমি বন্ধু-বান্ধবের দারস্থ হয়েছি, বন্ধু বান্ধবেরা যখন সাহায্য করতে অসমর্থ হয়েছেন তখন সম্ভবপর স্থলে আমি কল্পনার আশ্রয় নিয়েছি— কল্পনার আশ্রয় নিয়ে দেখেছি কল্পনাও একেবারে প্রয়োজনীয় শব্দটি এনে দিতে পারে। (পরে অনূদিত কবিতা নিয়ে কবিদের সঙ্গে যখন আলোচনপায় বসেছি তখন দেখতে পেয়েছি কল্পনার সাহায্যে সত্যিই প্রার্থিত শব্দটি পাওয়া গেছে।) প্রার্থিত শব্দের জন্য আমাকে কখনো মৎস্যজীবী, কখনো কৃষিজীবী, কখনো সাধারণ ব্যবসায়ীর কাছেও যেতে হয়েছে—আর আমি হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পেরেছি ভারতীয় মুনি-ঋষিরা শব্দকে কেন ব্রহ্ম বলেন। অনুবাদ কবিতায় মূল কবিতার রূপ রস ব্যঞ্জনা বা কাঠামোটি যাতে অবিকৃত থাকে আমি সেদিকে লক্ষ্য রেখেছি—প্রয়োজনে অনেক পংক্তির 'আন্তর ভাষ্য' করেছি; তখন মনে হয়েছে অনুবাদও কবিতা নির্মাণের মতোই কবি-কর্ম। কবিতার অনুবাদে যাতে সার্থক ও মূলানুগ হয়, যাতে অনুবাদেও মূল কবিতার সঙ্গীত রক্ষা পায়, সেজন্য আমি সচেষ্ট থেকেছি, প্রয়োজনে 'কাব্যিক শব্দ— কয়েকটি ক্ষেত্রে কবি প্রসিদ্ধিরও অনুসরণ করেছি। অনূদিত কবিতায়, প্রয়োজনে,

কবি-প্রসিদ্ধির পথ ধরে একজন অনুবাদক কবি অগ্রসর হতেই পারেন; সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ-কর্ম তার উজ্জ্বল উদাহরণ। আর এই পদ্ধতিতে অনুবাদে ব্রতী হলে অনুবাদ-কর্ম অনুসৃষ্টি হয়ে ওঠে স্বাভাবিকভাবে। বস্তুত কাব্যিক শব্দকে প্রশ্রয় দিয়ে—শব্দচয়নে কবি প্রসিদ্ধির পথ ধরে অগ্রসর হয়েও অনুবাদ সার্থক হতে পারে—ব্যঞ্জনাময় হয়ে অনুসৃষ্টিতে রূপান্তরিত হতে পারে। তাই কবিতার অনুবাদ কাব্যিক ভাষায় বা গদ্য ভঙ্গিমায়, দু'ভাবেই হতে পারে; কাব্যিক ভাষায় বা গদ্য-ভঙ্গিমায়, যেভাবে মূল কবিতার অনুবাদ উৎরায় ভালো, সে-ভাবেই অনুবাদ সঙ্গত।

২

'আধুনিক অসমীয়া কবিতা'র এই সংকলনটির পাণ্ডুলিপি (কবিতার সংখ্যা যখন ছিল ১৩৯, গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির জন্য সব কবিতা প্রকাশ করা সম্ভব হল না) গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ডঃ বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত দেখেছেন। তাঁর নির্দেশে আমি অনূদিত কবিতার কয়েকটি শব্দ পরিবর্তন করেছি—দু'টি কবিতার দুই পংক্তির ছন্দগত ঈষৎ ত্রুটিও সংশোধন করেছি। এতৎসত্ত্বেও প্রুফ দেখার সময় কয়েকটি শব্দের অপপ্রয়োগ আমাকে সংশোধন করতে হয়েছে।

গ্রন্থভুক্ত বেশ কিছু কবিতা বিভিন্ন সময়ে সাহিত্য পত্রিকা 'পৃথিবী', 'স্বাক্ষর', 'পূর্বা' (গৌহাটি), 'উমিয়াম' (শিলং), 'বোধ' (চিত্তরঞ্জন) এবং কলকাতা থেকে প্রকাশিত কবিতার কাগজ 'ইন্দ্রাণী'তে প্রকাশ পেয়েছে। এ ব্যাপারে কবি সম্পাদক নির্মল বসাকের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ, তাঁর সম্পাদিত 'ইন্দ্রাণী'র একটি সংখ্যায় তিনি ১১টি অনুবাদ কবিতা প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা অসঙ্গত নয়, শিলঙে থাকাকালে আমার সম্পাদিত কবিতার কাগজ 'ঋতুরঙ্গ'-এর দুইটি সংখ্যায় গ্রন্থভুক্ত বেশ কিছু কবিতা অনুবাদকর্মের সূচনাতেই প্রকাশ পেয়েছিল।

এই সংকলনের কবিতাগুলো ১৯৮৪ সালের মধ্যে প্রকাশিত অসমীয়া সাহিত্য পত্রিকা বা কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে এবং অনুবাদকর্মটিও সমাপ্ত হয়েছে এই সময়সীমা অতিক্রম করে।

বিশিষ্ট কবি মহেন্দ্র বরার কবিতা এই সংকলনভুক্ত করতে না পারায় আমি বেদনাহত।

সত্তর ও আশির দশকের কবিদের নিয়ে এ ধরনের একটি সংকলন করার আন্তরিক ইচ্ছা রইলো। গ্রন্থে কলেবর বৃদ্ধি ও প্রকাশের অনিশ্চয়তার কথা ভেবেই এতকাল তাঁদের কবিতার অনুবাদে হাত দিইনি।

গ্রন্থ-রচনার সূচনা থেকেই অনেক খোঁজ খবর নিয়ে আমাকে উৎসাহিত করেছেন এবং গ্রন্থটির আশু প্রকাশের জন্য আন্তরিক তাগিদও দিয়েছেন। আর এঁদেরই মধ্যেকার দুই ব্যক্তির কাছ থেকে অনূদিত কবিতায় ব্যবহারের উপযুক্ত কয়েকটি শব্দও পেয়েছি।

এই গ্রন্থটি আসামের বিখ্যাত পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক স্বর্গত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য (বাংলায় লেখা গবেষণামূলক বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ 'কামরূপ শাসনাবলী'র লেখক) এবং প্রখ্যাত ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের পুণ্যস্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত। পুণ্যশ্লোক এই দুই ব্যক্তি আমার ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি ছিলেন। তাঁদের মহৎ জীবন চরিত শৈশব থেকেই আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তাই এই গ্রন্থ উৎসর্গ।

এই গ্রন্থের কবি বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে সৈয়দ আব্দুল হালিম প্রমুখ, অনুদিত কবিতা নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের তাঁদের মূল্যবান সময় দিয়ে বাধিত করেছেন।

সবশেষে (এ গ্রন্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে) আমার শুভানুধ্যায়ী সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিষ্ণুপথ
রুক্মিণী গাঁও
গৌহাটি-২২
১৯৯২ র.না.ভ

গ্রন্থ প্রকাশ উপলক্ষে গ্রন্থকারের দু'চার কথা

মাননীয় রাজ্যপাল, শ্রদ্ধেয়া সভানেত্রী, অগ্রজ কবিবৃন্দ, অনুজ কবিকুল, উপস্থিত সুধীবৃন্দ প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট অতিথি,

অনুবাদ সাহিত্যের একটি ধারা। এক ভাষার সাহিত্যকর্ম অন্য ভাষভাষী লোকের কাছে পৌঁছিয়ে দেবার সদিচ্ছা থেকেই এই ধারাটির জন্ম। সুদূর অতীতে প্রথম যেদিন বাল্মীকি রামায়ণ অনুদিত হয়েছিল নব্য ভারতীয় কোনো একটি আর্যভাষায় বোধ করি সেদিন থেকেই ভারতবর্ষীয় উপমহাদেশের সাহিত্যে এই ধারাটি প্রবাহিত আর এই ধারাটির উদ্দেশ্যই হচ্ছে সাহিত্যের দিগন্ত বিস্তৃত করা— মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে ভাব বিনিময়ের মধ্য দিয়ে মৈত্রী স্থাপন করা।

কারো কারো প্রশ্ন কেন কেন কোনও একটি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার কবিতা বা অন্য কোনও নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার কবিতা তর্জমা না করে চল্লিশ-পঞ্চাশ আর ষাটের দশকের কিছু অসমীয়া কবিতার বাংলা ভাষান্তর? উত্তরটি খুবই সহজ : আমি আসামের মানুষ; বরাক, কুশিয়ারা থেকে মহাবহু ব্রহ্মপুত্রের জলধারায় পুষ্ট আমার শরীর, আসাম প্রকৃতির রূপরস, গন্ধ স্পর্শে উন্মোচিত আমার আত্মা, আসাম আমার আজন্ম পরিচিত বাসভূমি, তার নদী অরণ্য পর্বত, তার পাখির কাকলি, তার লোকগীতি, লোকনৃত্য, লোক উৎসব মেঘমল্লার বাজায় আমার প্রাণের গভীরে। আর অসমীয়া কবিতা যেহেতু আসাম প্রকৃতি আর অসমীয়া জীবনের বাঙ্ময় প্রকাশ আর সে প্রকাশের তাৎপর্য যেহেতু জন্মসূত্রে আমি বুঝতে পারি অবলীলাক্রমে তাই, তাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অসমীয়া কবিতার অনুবাদ করেছি বাংলা ভাষায়। আর এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো, এই কাজে আমার সময় লেগেছে দশ বর্ষ কাল— ১৯৭৫-এ কাজটি আরম্ভ করেছিলাম— কাজটি শেষ করেছি ১৯৮৪ সালে।

অন্য একটি কারণেও অসমীয়া কবিতার বাংলা ভাষান্তরে আমি খুবই বিশ্বাসী, কারণটি হচ্ছে অসমিয়া নব্য ভারতীয় আর্যভাষা এবং একটি নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার কবিতাই ওই গ্রুপের অন্য একটি ভাষায় অনূদিত হলে তা সার্থক কবিতা হয়ে ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা— ভাষা, মানসিকতা ও সাংস্কৃতিক নৈকট্যই তার কারণ। বাংলা, অসমীয়া ও ওড়িয়া মাগধী প্রাকৃতজাত নব্য ভারতীয় আর্যভাষা— তাই ভাষা তিনটির মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই যথেষ্ট আত্মীয়তা। ভৌগোলিক সহাবস্থানের জন্যও আসাম, বাংলা ও উড়িষ্যার মধ্যে সাংস্কৃতিক ও মানসিক নৈকট্য অনস্বীকার্য। তাই ভাষাত্রয়ীর যে-কোনো একটি থেকে অন্যটিতে কবিতা

অনুদিত হলে তা মূল কবিতার মতোই স্বাদনীয় হতে পারে— অবশ্যই অনুবাদক কবি যদি যথেষ্ট নিষ্ঠাবান হন তার কাজে।

কবি হেম বরুয়া-অমূল্য বরুয়া থেকে শুরু করে কবি হরেকৃষ্ণ ডেকা-আব্দুল হালিমের নির্বাচিত কবিতা নিয়ে এই সংকলন এবং ১৯৮৪ সাল অনতিক্রম করে প্রকাশিত কবিতাবলি থেকেই নির্বাচিত হয়েছে গ্রন্থভূক্ত কবিতা। অসমীয়া কবিতার বিকাশের ক্ষেত্রে যেসব কবির ভূমিকা ও অবদান অনস্বীকার্য এবং সমালোচকেরা যাদের কবিকর্মের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন বা যাদের কবিতা আমার কাছে রসোতীর্ণ বলে মনে হয়েছে তাদের কবিকর্ম নিয়েই এই সংকলন। গ্রন্থভুক্ত কবিতার সংখ্যা কোনো- কোনো কবির ক্ষেত্রে বেশি কোনো কোনো কবির ক্ষেত্রে কম— তার অর্থ এই নয় যে যে সব কবির কবিতা সংখ্যায় বেশি তারাই উজ্জ্বল আর অন্যরা ভাস্বর নন। এ ধরনের সংকলনে কারো কারো ক্ষেত্রে দুটি চারটি কবিতা কমবেশি হতেই পারে কারণ সংকলক ভিন্ন ভাষী আর তাই তাঁর সাহিত্য রুচি কিছু পরিমাণে হলেও তাঁর মাতৃভাষীর সাহিত্য রুচির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

এই সাংস্কৃতিক কর্মে নবম শ্রেণি থেকে আমার কণ্ঠস্থ রবীন্দ্রনাথের দুটি পঙ্‌ক্তি "বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো" আমাকে খুবই উদ্‌বুদ্ধ করেছে। আর এই পঙ্‌ক্তি দু'টি যখনই আবৃত্তি করি কে যেন আমার কানে কানে বলে যায় : সবার সঙ্গে রং মেলাতে হবে— সবার সঙ্গে রং মেলাতে হবে। আর যে দু'জন বিখ্যাত আত্মীয় ব্যক্তির স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থটি উৎসর্গীকৃত তাঁরাও আমাকে গভীরভাবে উৎসাহিত করেছেন এই সাংস্কৃতিক কর্মে। পঁচিশ বছরে রচিত, প্রথম ব্যক্তি পদ্মনাথ ভট্টাচার্যের বিখ্যাত সাংস্কৃতিক কর্ম আসাম ইতিহাসের আকরগ্রন্থ 'কামরূপ শাসনাবলি' এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি রামনাথ বিশ্বাসেরর বিশ্বভ্রমণ কালে দেশে দেশে ভারতীয় সংস্কৃতির উপর বক্তৃতাদান আমাকে আমাদের দেশের সংস্কৃতির গভীরভাবে শ্রদ্ধাবান করে তোলে। বলাবাহুল্য, অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতির প্রতি এই যে আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য তা বৃহত্তর ভারত সংস্কৃতির প্রতিই শ্রদ্ধা-নিবেদন আর তা আমি পরোক্ষত পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পারিবারিক সূত্রে প্রত্যক্ষত পেয়েছি পদ্মনাথের-রামনাথের কাছ থেকে।

পরিশেষে জানাই এই গ্রন্থটি অসম প্রকাশন পরিষদের আর্থিক সাহায্যে প্রকাশিত এবং এজন্য আমি আসাম সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ। ২১.১০.১৯৮৯- এ শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন গোস্বামী যখন আসামের শিক্ষামন্ত্রী এবং শ্রীযুক্ত অশোক শইকীয়া যখন শিক্ষা বিভাগের কমিশনার সেই সময়ে আমি গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য আসাম সরকারের কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন করি। এই দুই বিশিষ্ট ব্যক্তি এ ব্যাপারে খুবই সহায়তা করেন— তাঁদের কল্যাণ হাতের স্পর্শ না পেলে গ্রন্থটি আদৌ পৃথিবীর আলোবাতাসের সংস্পর্শে আসতো কিনা পরমেশ্বরই জানেন। এই ব্যক্তিদ্বয়কে তাই কৃতজ্ঞতা জানাই। এখানে বলে রাখা ভালো, এই সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকারের আর্থিক সাহায্য আমার হাতে এসে পৌঁছায় ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে।

এই সংকলনের কবিকুলকে এবং আমার অন্যান্য শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিবর্গকে এই গ্রন্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে সাহায্য করার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। আর জানাই সত্তর আশির দশকের কবিদের নির্বাচিত কবিতা নিয়ে এধরনের একটি সংকলন করার আন্তরিক ইচ্ছা রইলো। এতকাল কলেবর বৃদ্ধির জন্য ও প্রকাশের অনিশ্চয়তার ভয়ে এ কাজে হাত দিইনি।

কার্যসূচী

স্থান : লক্ষ্মীরাম বরুয়া সদন, গুয়াহাটী-১

তারিখ : দিন ১২-১৫ বজা

১। সভানেত্রী : ডঃ নির্মলপ্রভা বৈদ

২। গ্রন্থ উন্মোচন : মাননীয় শ্রীলোকনাথ মিশ্র, রাজ্যপাল, অসম

৩। মুখ্য অতিথি : ডঃ বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য

৪। বিশিষ্ট অতিথি : শ্রীনবকান্ত বরুয়া

অগ্রজ প্রতিম নীলমণি

নিবন্ধটির শিরোনাম আমার একটি কবিতার প্রথম পংক্তির প্রথমাংশ। এই শিরোনামাতেই স্বপ্রকাশ কবি নীলমণি ফুকনের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা-ভালোবাসা এবং তিনি যে আমার আত্মীয় প্রতিম অন্তরঙ্গজন এটি তারও বার্তাবাহক। আজ ছাব্বিশ বছর তাঁর সাথে আমার পরিচয়—দীর্ঘদিনের পরিচয় সূত্রে তিনি হয়ে উঠেছেন আপনজন। আমার কবিতা রচনার ক্ষেত্রে তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি অফুরান উৎসাহ—আধুনিক অসমীয়া কবিতার বাংলা ভাষান্তর পর্যায়ে তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি পরম বন্ধুর মতো সহযোগিতা—এমনকী আমার বাড়ির জমি হস্তান্তরের জন্যও মালিককে তিনি করেছিলেন লিখিত অনুরোধ। এক-কথায় আমার জীবনে তাঁর আসন খুবই উঁচুতে—কবি নীলমণি ফুকন—শ্রদ্ধাস্পদ নীলমণিদার উৎসাহ ব্যতিরেকে হয়তো মাতৃভাষা বাংলাতেও দীর্ঘদিন আমার পক্ষে কাব্য রচনা সম্ভবই হতো না—আধুনিক অসমীয়া কবিতার বাংলা ভাষান্তর আদৌ বাস্তবে রূপান্তরিত হতো না। আর তাই, তাই তিনি আমার হৃদয়ের অনেকখানি জুড়ে আছেন—অগ্রজের মতোই আমার জীবনে তাঁর ভূমিকা।

ব্যক্তি জীবনে যেমন সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথ উচ্চারিত 'দিবে আর নিবে'র ভিত্তিতে গড়ে ওঠে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মধুর সম্পর্ক। আর একমাত্র তখনই ভুবনের "সব ঠাঁই আছে মোর ঘর।" অসমীয়া সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা, আসাম দেশের প্রতি আমার অকৃত্রিম প্রেম, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশ ও বুদ্ধদেব বসুর প্রতি নীলমণিদার অশেষ শ্রদ্ধা, বিশ্বকবিতার রাজ্যে তার অনায়াস বিচরণ, তাঁর কবিতার প্রতি আমার গভীর অনুরাগ, আমার কবিতার প্রতি তাঁর সানুরাগ দৃষ্টিপাত, আসাম ইতিহাসের আকর গ্রন্থের রচয়িতা পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের বাড়ির ছেলে হওয়ার সুবাদে আমার প্রতি তাঁর সস্নেহ মনোভাব—এসব কিছুর সমাহারেই তাঁর সাথে গড়ে উঠেছে আমার শ্রদ্ধা মিশ্রিত মধুর সম্পর্ক—তিনি হয়ে উঠেছেন আমার অগ্রজ-প্রতিম অন্তরঙ্গ জন—আমি হয়ে উঠেছি তাঁর অনুজ-প্রতিম।

১৯৭৫ সাল। নীলমণিদা তখন আর্য বিদ্যাপীঠ কলেজের ইতিহাসের প্রফেসর। সে বছরই ডিসেম্বরের প্রথম দিকে এক সকালবেলা তাঁর কর্মস্থলের একটি ঘরের বারান্দায় তাঁর সাথে আমার প্রথম পরিচয়। তাঁর পরণে ছিল ধুতি, শীত পড়ে গেছে তাই তাঁর ফুল শার্টের উপরে ছিল ছাই রঙের হাফ সোয়েটার। ইতিহাসের একটি ক্লাস সেরে মিষ্টি রোদ্দুর গায়ে মেখে কলেজের চাতাল ধরে তিনি ফিরে আসছিলেন প্রফেসার্স কমন রুমে। পথেই খবর পেলেন কে একজন তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছে। তিনি কমনরুমের

বারান্দায় এলে তাকে আমার পরিচয় দিলাম—তাঁর হাতে তুলে দিলাম শিলং থেকে প্রকাশিত একটি লিটিল ম্যাগাজিন। কাগজটিতে আমার একটি কবিতা ছিলো। তৎক্ষণাৎ তিনি সেই কবিতাটি পড়ে নিয়ে আমাকে বললেন, "ভাল লিখিছে দেই।" আর ওদিকে আসছে ক্লাসের ছেলেদের জানিয়ে দিলেন তাঁর কাছে একজন নবাগত এসেছেন। তাই কিছুক্ষণ বাদে তাদের ক্লাশ নিচ্ছেন। সেই ফাঁকে আমার সাথে আলাপ পরিচয় সেরে নিয়ে বললেন মাঝে মাঝে তাঁর মালীগাঁয়ের বাড়িতে যেতে।

জানুয়ারি ১৯৭৬। একদিন সকাল আটটায় নীলমণিদার বাড়িতে আমার প্রথম প্রবেশ। বিভিন্ন রকমের অর্কিট আর বিচিত্র ধরনের ফুলগাছে সাজানো তাঁর বাড়ি। এক-একটি ফুলগাছে এক রঙের বা বিচিত্র রঙের ফুল। মনে হলো বাড়িটি যেন এক তপোবন। সেদিন মধুস্বাদী রোদ্দুরে বসে একনাগাড়ে চার ঘণ্টাকাল তাঁর সাথে কবিতা বিষয়ে আলাপন। তাঁর কাছে আমার প্রশ্ন ছিল কী কী গুণের সমাহারে একটি কবিতা হয়ে ওঠে সার্থক কবিতা? শ্রেষ্ঠ কবিতা? বিশ্বকবিতার ভুবনে ভ্রমণরত নীলমণি অবলীলাক্রমে জবাব দিয়েছিলেন আমার প্রশ্ন দুটির। কথার ফাঁকে ফাঁকে এ প্রসঙ্গেই আরও অনেক ছোটো ছোটো প্রশ্ন করেছিলাম তাঁকে। সেদিন নীলমণিদার কণ্ঠে ভর করেছিলেন স্বয়ং সরস্বতী। কবিতা বিষয়ে আমার প্রশ্নমালার সাবলীল জবাব পেয়ে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বাড়ি ফিরলাম।

তারপর অনেক—অনেকদিন গিয়েছি নীলমণিদার বাড়ি। (দু-চারবার তিনি অনুগ্রহ করে এসেছেন আমার উলুবাড়ি বাসায়।) কত সকাল, কত সন্ধ্যা কত না বিকেল তিনি করেছেন কাব্য আলোচনা। মুখ্যত তিনি বক্তা। আমার ভূমিকা শ্রোতার। মাঝে মাঝে আমাকে বললেন : "আপনি এলে জমে ওঠে কবিতা বিষয়ে আলাপচারিতা। আরও দু'চারজন আছেন যাঁদের সঙ্গে কবিতা নিয়ে হয় অন্তরঙ্গ আলোচনা।"

এখন আমার খুব খারাপ লাগে কবিতা বিষয়ে তাঁর অমূল্য আলাপচারিতা ডায়েরীর আকারে লিপিবদ্ধ করে রাখিনি বলে। এই ভুলের জন্য নিজেকে ক্ষমা করতে পারি নি। প্রায়শ আত্ম-ধিক্কারে দীর্ণ হ'য়ে যায় আমার হৃদয়। তবুও বলি নীলমণিদা মনে করেন মিত-কথন, রূপক-ব্যবহার আর চলিত ভাষার যথাযথ প্রয়োগেই রচিত হতে পারে সার্থক কবিতা—এই তিনটেই কবিতা লেখার আসল চাবিকাঠি। যুগপৎ তিনি মনে করেন কবিতা রচনার ক্ষেত্রে প্রেরণা নামক রহস্যহময় বস্তুটির আর্বিভাবও জরুরী। তিনি তো প্রায়শই বলেন : "হাত পেতে থাকি সে (কবিতা) যদি আসে।"

তাঁর আর আমার আলাপচারিতায় প্রধানত স্থান পেয়েছে আধুনিক অসমীয়া কবিতা, আধুনিক বাংলা কবিতা, চীনা কবিতা আর জাপানি কবিতা। প্রায়শই তাঁর আলাপচারিতায় রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশ আর বুদ্ধদেব বসুর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। হালের বাংলা কবিতা বা অসমীয়া কবিতা তাঁকে তেমন করে তৃপ্ত করে না—কেন না দু'টি ভাষার ইদানীংকার কবিতা খুব সহৃদয়-হৃদয় সংবাদী নয়—দুটি ভাষার কবিতাতেই বড় বেশি শব্দের কচকচানি—বহু ব্যবহারে জীর্ণ শব্দবলীর ব্যবহার—দু'টি ভাষাতেই মাত্র দু'চার

জন লিখছেন নিজস্ব ঘরানায়। মিত কথনে আর রূপক প্রয়োগে রচিত চীনা কবিতা, জাপানী কবিতা তাঁকে মুগ্ধ করে। তাঁর সমসাময়িকদের রচিত অসমীয়া কবিতা বা বাংলা কবিতা তাঁর ভালো লাগে, সে কারণে নবকান্ত বরুয়া, অজিত বরুয়া, হীরেন ভট্টাচার্য, ভবেন বরুয়া, নির্মলপ্রভা বরদলৈ প্রমুখের অনেক কবিতার তিনি পঞ্চমুখে প্রশংসা করেন। তাঁর সমসাময়িক বাংলা ভাষার কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শামসুর রহমান, আলমাহ্‌মুদ, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের বহু কবিতারও তিনি রসাস্বাদন করেন।

বিটোফেনের সিম্ফনির মতোই রবীন্দ্রনাথের গানও তাঁর প্রিয়। রবীন্দ্রনাথের সব কবিতা তাঁকে তেমন করে আকর্ষণ করে না তবে তাঁর 'সঞ্চয়িতা' তাঁর মতে বিশ্ব সাহিত্যের প্রথম দশটি গ্রন্থের একটি। জীবনানন্দ দাশ তাঁর সুপ্রিয় কবি। তিনি মনে করেন তাঁর প্রথম দিকের কবিতা জীবনানন্দের দ্বারা প্রভাবিত। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথের পর বুদ্ধদেব বসুই ভারতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। চন্দ্রপ্রসাদ আগরওয়ালার কবিতা—কবীরের দোঁহা তাঁকে অভিভূত করে।

ব্যক্তিগতভাবে নীলমণিদার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। আমার সৌভাগ্য তাঁর সাথে পরিচয় হওয়ার পর থেকে আমার প্রতিটি কবিতা তাঁকেই পড়তে দিই। তিনি আমার প্রতিটি কবিতা খুব মনোযোগ সহকারে পড়েন—প্রতিটি কবিতার উপর তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন—কবিতার কোথাও কোনও ত্রুটি লক্ষিত হলে তা সংশোধন করার পরামর্শ দেন। এমনকী আমার কাব্যরচনার প্রথম দিকে আমার কবিতা যাতে আধুনিক ইউরোপীয় কবিতার ভাবধারার স্পর্শে সমৃদ্ধ হয় সেজন্য ওই মহাদেশের বহু বিখ্যাত কবির (প্রকাশক সহ) নির্বাচিত কবিতার একটি তালিকা তিনি আমাকে প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। জানি না, ভূ-ভারতে এরকম সহৃদয় কবি কজন আছে?

এখন পর্যন্ত আমার যে চারটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে সেগুলির প্রথম দু'টির কবিতাগুলির নির্বাচন করে দিয়েছেন নীলমণিদা। পরবর্তী দুটি গ্রন্থের কবিতাগুলি প্রকাশের পূর্বে তাঁকে দেখিয়েছি। সে দু'টির প্রকাশেও রয়েছে তাঁর অনুমোদন। এভাবে তিনি কবিতা রচনার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে আমাকে উৎসাহিত করে আসছেন। আমার 'এবং পৃথিবী'র পাণ্ডুলিপি প্রেসে পাঠানোর প্রাক মুহূর্তে গ্রন্থটির উপর তাঁর মন্তব্য : So long you wrote only good poems, now you have began to write excellent poems. There are seven to eight excellent poems in this book." আমার 'লুইতের পদাবলী' নামের কবিতার বই প্রেসে দেওয়ার আগে তিনি বলেন : There are twelve to sixteen excellent poems in this book," আমার 'নির্বাচিত সনেট' নামের গ্রন্থটির নামকরণ করেন নীলমণিদা-ই। এই গ্রন্থটি প্রেসে দেবার প্রাক মুহূর্তে তাঁর মন্তব্য : There are twenty to twenty two excellent poems in this book." এভাবেই তিনি বাংলা ভাষার একজন অনুজ কবির পথ-প্রদর্শন করে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে তিনি দুঃখ

প্রকাশ করেন আমার কবিতা পশ্চিম বাংলায় যথাযথভাবে সমাদৃত হচ্ছে না বলে। এই সেদিন কলকাতা থেকে প্রকাশিত শিবনারায়ণ রায় সম্পাদিত অতি উঁচুমানের সাহিত্যর পত্রিকা 'জিজ্ঞাসা' আমার 'লুইতের পদাবলী'র আলোচনা প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখলেন; "রমানাথ ভট্টাচার্যকে এক স্বতন্ত্র ঘরানার কবি হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। বহমান মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে নিজস্ব একটি প্রবাহ পথ খুঁজে নিয়েছেন। বেশি লেখেন না।" ...পড়ে নীলমণিদার কী অভাবনীয় আনন্দ। এভাবে তিনি হয়ে উঠেছেন আমার অন্তরঙ্গ জন—আমার অগ্রজ প্রতিম। নীলমণিদা আমাকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সস্নেহ দৃষ্টিতে দেখেন এ নিয়েও জল কম ঘোলা হয়নি। একদা আমার একটি গ্রন্থের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে একজন বিখ্যাত কবি তো বলেই ফেললেন : "As you walk togather with Nilmani why you should not write well." ভাবতে অবাক লাগে নীলমণিদা কবিতার ক্ষেত্রে আমাকে উৎসাহিত করেন বলে আমাদের কেন এই কটাক্ষ। আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে জমা পড়েছে এরকম আরও কয়েকটি অভিজ্ঞতা।

আমার 'আধুনিক অসমীয়া কবিতা'র বাংলা ভাষান্তর পর্যায়ে নীলমণিদার অবদান অশেষ। এই গ্রন্থটির পাতায় পাতায় বর্ষিত হয়েছে তাঁর স্নেহদৃষ্টি। তখন সবেমাত্র আমার কর্মস্থল শিলং থেকে গুয়াহাটিতে স্থানান্তরিত হয়েছে। নীলমণিদা আর হীরেন ভট্টাচার্য বাদে আসামের অন্য কোনও বিশিষ্ট কবির সাথে আমার পরিচয় ছিলো না। নীলমণিদার ড্রয়িং রুমেই কবি নবকান্ত বরুয়া ও কবি সমালোচক ভবেন বরুয়ার সাথে আমার পরিচয় হয় এবং নীলমণিদাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমি যে আধুনিক অসমীয়া কবিতার বাংলা ভাষান্তরে হাত দিয়েছি তা সবিস্তারে তাঁদের বলেন। অতঃপর অনুবাদ সংক্রান্ত ব্যাপারে অন্যান্য বিশিষ্ট কবির সাথে যোগাযোগ স্থাপন করলে নীলমণিদা এই কর্মকাণ্ডের উৎসাহ দাতা জেনে সবাই আমাকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং অসমীয়া কবিতার বাংলা ভাষান্তরে আমার যোগ্যতা তাঁদের কাছে প্রশ্নাতীত বলে মনে হয়েছে।

'আধুনিক অসমীয়া কবিতা'র অনুবাদ পর্যায়ে ভাষান্তরিত কবিতা নিয়ে কত সকাল, কত দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা অবধি নীলমণিদার সাথে আলোচনা করেছি তার ইয়ত্তা নেই। তাঁর সম্পাদিত 'কুরি শতিকার অসমীয়া কবিতা' আমার অনুবাদ কর্মে খুব কাজে লেগেছে কেননা এই গ্রন্থটিতে ফুটে উঠেছে গত শতাব্দীর অসমীয়া কবিতার রূপরেখা। আমার 'আধুনিক অসমীয়া কবিতা' গ্রন্থটিতে বেশ কিছু কবিতা গৃহীত হয়েছে এই গ্রন্থটি থেকেই। 'আধুনিক অসমীয়া কবিতা'র ভূমিকা রচনাকালেও প্রচুর গ্রন্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন নীলমণিদা কিন্তু কস্মিনকালেও কোনো পরমার্শ দেননি এ ব্যাপারে। কখনো অনুরুদ্ধ হয়ে বলেছেন, "যে-সব গ্রন্থের কথা বললাম সেগুলি পড়ে যান—দেখবেন লেখা হয়ে যাবে ভূমিকা।" কার্যক্ষেত্রে তাই হয়েছিল। এই গ্রন্থে সংখ্যাগত পরিমাণে তাঁর কবিতা বেশি নেওয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট কোনো-কোনো কবির ধারণা তার পশ্চাতে কাজ করেছে তাঁর ও আমার অন্তরঙ্গতা। ব্যাপারটি আদৌ তা নয়। কেননা গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি প্রেসে

দেওয়ার পরেও তাঁর কবিতার সংখ্যা আরও কমিয়ে দিতে বলেন নীলমণিদা। আমি উল্টে তাঁকে বলি গ্রন্থটিতে তাঁর আরও পাঁচ-ছটি কবিতা দেওয়ার ইচ্ছা ছিল আমার। তখন তিনি নিরুত্তর হয়ে যান। এখানে বলে রাখা ভালো, ভবেন বরুয়ার মতো আমিও মনে করি বিংশ শতাব্দীর অসমীয়া কবিতার শ্রেষ্ঠ পুরুষ নীলমণি ফুকন। তাই অনূদিত গ্রন্থ 'আধুনিক অসমীয়া কবিতা'য় তাঁর অধিক সংখ্যক কবিতার অন্তর্ভূক্তি সঙ্গত কারণেই যুক্তিযুক্ত।

আমার ও নীলমণিদার খুব ইচ্ছে ছিল 'আধুনিক অসমীয়া কবিতা' গ্রন্থটি বাংলা ভাষার কোনও বিশিষ্ট কবির একটি ভূমিকাসহ কলকাতা থেকে প্রকাশ করার। সেজন্য গ্রন্থটির ভূমিকা লেখার ব্যাপারে শ্রীযুক্ত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে পত্রযোগে নীলমণিদা অনুরোধ করেন এবং সে সময়কার কলকাতাস্থিত আসাম হাউসের উপরওয়ালা শ্রীযুক্ত জিতেন শর্মাকে চিঠি লেখেন তাঁর চেষ্টায় কলকাতা থেকে গ্রন্থটি প্রকাশ করা সম্ভব হলে গ্রন্থকার স্বয়ং পাণ্ডুলিপিসহ সেখানে যাবেন। এ ব্যাপারে শ্রীযুক্ত শর্মার কাছ থেকে ইতিবাচক পত্র পেয়ে আমি আমার এক আত্মীয়সহ কলকাতা যাই এবং আসাম হাউসে উঠি। ওখানে শ্রীযুক্ত শর্মার সাথে এ ব্যাপারে আলাপ হলে তিনি আমাকে জানালেন তাঁর কর্মস্থল গুয়াহাটিতে স্থানান্তরিত হ'য়ে গেছে। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি তাঁর নতুন কর্মস্থল চলে যাচ্ছেন। তবুও তিনি সেই স্বল্প সময়ের মধ্যেই কলকাতা থেকে গ্রন্থটি বের করার উদ্দেশ্যে আমাদের নিয়ে গেছেন ওখানকার অনেক প্রকাশকের কাছে। আমার দুঃখ, কার্যত তাঁর পরিশ্রম সার্থক হয়নি। বোধ করি, তাঁর কলকাতা থেকে বদলি হওয়ার জন্যই তাঁর চেনাজানা কোনো প্রকাশক গ্রন্থটির প্রকাশের ব্যাপারে উৎসাহ দেখাননি। অতঃপর কলকাতা থাকাকালেই আমার পরিচিত ওখানকার এক প্রকাশক গ্রন্থটি প্রকাশ করবেন বলে আমাকে প্রতিশ্রুতি দেন এবং গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি জমা রাখেন। পাণ্ডুলিপি জমা দেওয়ার পর তাঁকে আমি বললাম : "শ্রীযুক্ত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন গ্রন্থটির একটি ভূমিকা লিখে দিবেন। আপনি তাঁর কাছ থেকে ভূমিকাটি সংগ্রহ করে গ্রন্থটির সাথে যুক্ত করবেন।" তিনি আমার কথায় সম্মত হলেন। এমনকী শ্রীযুক্ত নবকান্ত বরুয়ার সাথে কলকাতায় তাঁর দেখা হলে তাঁকে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলেন : "রমানাথের 'আধুনিক অসমীয়া কবিতা' গ্রন্থটি আমি হাতে নিয়েছি—প্রকাশ করবো।" এসব জানুয়ারী ১৯৮৬-এর কথা। কার্যক্ষেত্রে গ্রন্থটি কলকাতা থেকে বেরোয়নি। প্রায় চার বছর গ্রন্থটির প্রকাশের অপেক্ষায় থেকেছি—মাঝে মাঝে প্রকাশকটির কাছে এ ব্যাপারে রেজিস্টার্ড চিঠি ছেড়েছি—টেলিগ্রাফ করেছি—তাঁর ঘুম ভাঙেনি। অতঃপর নীলমণিদা গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য ভিন্ন পথ অবলম্বন করেন। সে কথাই এখানে বলছি।

১৯৮৯-এর মাঝামাঝি একদিন নীলমণিদা আসামের তদান্তিন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন গোস্বামী সহোদয়কে 'আধুনিক অসমীয়া কবিতা' (বাংলা ভাষান্তর) গ্রন্থটির জন্য সরকারি সাহায্য মঞ্জুরের অনুরোধ করেন। মন্ত্রীমহাশয় নীলমণিদার অনুরোধের গুরুত্ব বুঝে তাঁকে বলেন : "গ্রন্থকারকে বলুন এ ব্যাপারে আবেদন করার জন্য।" মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশ

অনুসারে ১৯৮৯ এর ২১শে অক্টোবর সকালবেলা আবেদনপত্র সহ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি আবেদন পত্রে অর্থ মঞ্জুরীর পক্ষে আদেশ দেন এবং তা শিক্ষা বিভাগের তদান্তিন কমিশনার শ্রীযুক্ত অশোক শইকীয়ার কাছে নিয়ে যেতে বলেন। তার প্রায় আড়াই বছর পরে গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য অসম প্রকাশন পরিষদের মাধ্যমে আসাম সরকারের আর্থিক অনুদান আমার হাতে আসে। নীলমণিদার সুপারিশ, "মন্ত্রী মহোদয়ের আদেশ, শ্রীযুক্ত শইকীয়া ও অসম প্রকাশন সেক্রেটারি স্বর্গত সতীশ ভট্টাচার্যের আনকূল্য এবং আমার অক্লান্ত চেষ্টায় সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্তি সম্ভব হয়েছিলো। এখানেই নীলমণিদা থেমে রইলেন না। গ্রন্থটি যাতে আসাম থেকেই সুচারু রূপে বেরোয় সেজন্য তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন গুয়াহাটির বিখ্যাত প্রকাশক শ্রীযুক্ত বদন বরুয়ার কাছে এবং গ্রন্থটির প্রচ্ছদ নির্মাণের জন্য নিয়ে গেলেন বিখ্যাত চিত্রকর সমীরণ বরুয়ার নিকট। তাঁর নির্দেশ অনুসারেই গ্রন্থটির ছাপার কাজ সম্পাদন করেছেন বরুয়া এজেন্সি। গ্রন্থটির মুদ্রণ সমাপ্ত হলে নীলমণিদা আমাকে বললেন : "এত পরিশ্রম করে লেখা গ্রন্থটি যাতে আসামের রাজ্যপাল উন্মোচন করতে পারেন তার ব্যবস্থা করুন।" এই গ্রন্থটিকে তিনি একটি মনুমেন্টাল ওয়ার্কস মনে করেন তাই তাঁর এই প্রস্তাব। তাঁর নির্দেশ অনুসারে আমি সে রকম ব্যবস্থা করেছিলাম। ১৯৯৩-এর ৮ই এপ্রিল দুপুর ১২টা১৫ মিনিটে গুয়াহাটিস্থিত লক্ষ্মীরাম সদনে সাহিত্য সংস্কৃতি সংক্রান্ত বিখ্যাত সংগঠন 'সাহিত্যকানন' -এর এক বিশেষ সভায় বহু প্রথিতযশা কবি সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে আসামের তদানীন্তন রাজ্যপাল মাননীয় লোকনাথ মিশ্র গ্রন্থটি উন্মোচন করেন। সেদিনকার সভার সভানেত্রী ছিলেন কবি নির্মলপ্রভা বরদৈলে, মুখ্য অতিথি ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক স্বর্গত বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য ও বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন কবি নবকান্ত বরুয়া। উক্ত সভা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তৎপর ছিলেন সংগঠনটির সভাপতি খনীন্দ্রচন্দ্র দাস, প্রাক্তন সেক্রেটারি ডঃ নগেন চৌধুরী ও বর্তমান সেক্রেটারি বিমলকুমার হাজরিকা। আর ওই সভার আহ্বায়ক ছিলাম আমি নিজে।

নীলমণিদার স্নেহ ভালোবাসা আমার জীবনে আশীর্বাদ স্বরূপ। তাঁর স্নেহ ভালোবাসা ব্যতিরেকে আমার পক্ষে দীর্ঘকাল ধরে কবিতা লেখা আদৌ সম্ভব হতো না। জীবনের সোনালি দিনগুলিতে কত সকাল, কত বিকাল কত সন্ধ্যা, তাঁর সাথে হয়েছে কবিতা নিয়ে অন্তরঙ্গ আলোচনা। মুখ্যত তিনি বক্তা, আমার ভূমিকা শ্রোতার। এখনো তাঁর বাড়িতে গেলে কবিতা আলোচনার ঝর্নাধারা প্রবাহিত হয় ঝরঝর করে। মনে হয় তাঁর আর আমার মধুর সম্পর্কই তার কারণ। একদিনের কথা বলছি—তাঁর আর আমার কাব্যলোচনা একসময়ে তুঙ্গে উঠেছে—ব্যক্তিগত প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয়েছে সে মুহূর্তে তাঁকে আমি জিগ্যেস করলাম : "আপুনি কেলৈ মোক ইমান ভাল পায়?" তিনি খুব স্নিগ্ধ স্বরে জবাব দিলেন : "আপুনি নেজানে পৃথিবীর কিমান মঙ্গলর কারণে এজন কবির জন্ম।"

নীলমণিদা সাধারণ মানুষকেও কী গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখেন সেরকম একটি ঘটনা আমার স্মৃতি থেকে এখানে উদ্ধার করছি। দশ বারো বছর আগে এক শীতের সকালে একজন ভিখিরি তাঁর ড্রয়িং রুমের দুয়ারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন ওই রুমের ভেতরে সাজানো চিত্র ভাস্কর্য। সে মুহূর্তে নীলমণিদা তাঁকে বললেন : "ভিতরত আহি বহক! বস্তুপাতি ভাল দরে চাই যাক।" এরকমই মানুষের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ভালোবাসা। ইতিহাসের প্রফেসার নীলমণিদা; রাজনীতি নিয়েও আলোচনা হয় তাঁর সাথে। মহাত্মা গান্ধি আর সুভাষচন্দ্র বসুই তাঁর কাছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় স্বাধীনতা সংগ্রামী।

নীলমণিদার বাড়ির আতিথেয়তা দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো ব্যাপার। যে ভদ্রলোক একবার তাঁর বাড়িতে গেছেন তিনি কোনোদিন ভুলবেন না তাঁর উষ্ণ আতিথেয়তা। কোনও ভদ্রলোককে চা না খেয়ে তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে আমি দেখিনি—কোনও কারণ বশতঃ বৌদি বাড়িতে না থাকলে বা তিনি অসুস্থ হলে নীলমণিদা নিজ হাতে চা বানিয়ে খাইয়ে দেন আগন্তুককে। বলা বাহুল্য, তাঁর নিজের হাতে বানানো চা খাবার সৌভাগ্য আমার অনেকবার হয়েছে।

দীর্ঘদিন নীলমণিদার সান্নিধ্যে এসেছি। কখনও ভুল বোঝাবুঝি হয়নি। এক দুইবার তুচ্ছ কারণে একটু আধটু মান অভিমান হয়েছে। তাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা, আমার প্রতি তাঁর অনুজ প্রতিম স্নেহের ধারায় তা নিমেষে ভেসে গেছে। মনে পড়ে একদিন নীলমণিদা বলেছিলেন বন্ধুর দোষ ত্রুটি বড় করে দেখতে নেই। কথাটি জগৎ সংসারের সকলেরই মনে রাখা ভালো।

নীলমণিদা খুবই আন্তরিকভাবে বলেন অসমীয়া ভাষায় আমার একটি কাব্যসংকলন করার জন্য। আসাম থেকে লিখছি বলেই তাঁর এরকম ইচ্ছা। আমারও খুব বাসনা তাঁর ইচ্ছাটি বাস্তবায়িত করার।

১২/২০০১

গুয়াহাটি

অগ্রজ প্রতিমের প্রয়াণে

কয়েকদিন হলো বিশিষ্ট কৃষি-বিজ্ঞানী ড. প্রফুল্লচন্দ্র বরা মর্ত্যলোক থেকে অমর্ত্যলোকে গমন করেছেন। তাঁর মতো নরোত্তম ব্যক্তি, অজাতশত্রু মানুষ, সাহেবের বেশে ঋষি-প্রতিম লোক ধরাধামে দুর্লভ। তাঁর বিয়োগে অনেকেই আজ মর্মাহত— বেদনাবিধুর। অনেকেই চোখের জলে তাঁকে দিয়েছেন শেষ বিদায়। অনেকেরই স্মৃতিভূমে বেঁচে থাকবেন তিনি সুদীর্ঘ কাল।

জন্মমৃত্যু স্বাভাবিক ঘটনা— প্রকৃতির অমোঘ বিধান, তবু কারো কারো মৃত্যু অনেকের কাছে হয়ে ওঠে অসহনীয়। আসাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. বরার মৃত্যুও সেরকম একটি ঘটনা যা তার অগণিত ছাত্রছাত্রী, বন্ধুবান্ধব, তাঁর অনেক-অনেক শুভানুধ্যায়ী, গুণিজন আর আত্মীয় পরিজনের প্রাণে হেনেছে নিদারুণ আঘাত। তাঁকেই যেন উদ্দেশ্য করে কবি লিখেছিলেন:

প্রথম যেদিন তুমি এসেছিলে ভবে।
তুমি মাত্র কেঁদেছিলে হেসেছিল সবে।।
এমন জীবন হবে করিতে গঠন।
মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন।।

১৯৯৪ খ্রীস্টাব্দের ১৯ জুলাই রাতে প্রমথেশ পুরকায়স্থের বাড়িতে ডাকাতি হয়। পরদিন সন্ধ্যার পর পাড়ায় সুরক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার বাড়িতে বসে বিষ্ণুপথ উন্নয়ন সমিতির সভা। সভায় ড. বরার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। যাবার সময় সশ্রদ্ধায় তাকে উপহার দিয়েছিলাম আমার অনূদিত গ্রন্থ 'আধুনিক অসমীয়া কবিতা' (বাংলা ভাষান্তর) এবং আমার রচিত কাব্য সংকলন 'লুইতের পদাবলী'। তারপর থেকেই প্রায়শ তিনি আসতেন আমার বাড়িতে— আমিও প্রায়শ যেতাম জ্যোতি কটেজে। তার সাথে পরিচিত হয়ে আমি যেন এক স্বর্ণখণিতে প্রবেশ করলাম— চারদিকে সোনা আর সোনা। আজ তিনি লোকান্তরিত। শুধু শুধু মনে পড়েছে তাঁর কথা। কী অমায়িক ছিল তাঁর ব্যবহার, কি স্নিগ্ধ ছিল তাঁর বাচন, কী স্নেহসিক্ত ছিল তাঁর মন। হায়, এমন দুধে ধোয়া মনের স্পর্শ তো আর পাবো না। তাই বারংবার সজল হয়ে ওঠে চোখ।

ডঃ বরাকে আমি দাদা বলে সম্বোধন করতাম। তিনিও আমাকে অনুজ জ্ঞানে স্নেহ করতেন। কখনও কখনও আমি যেতে পারতাম না তাঁর বাড়িতে। তিনি এলেই ক্ষমা চেয়ে নিতাম আমার ত্রুটির জন্য। তিনি বলতেন: একো নহয়—একো নহয়। এমনি ছিলেন উদার প্রকৃতির।

আমরা তাঁর বাড়ি বা আমার বাড়িতে মিলিত হলে কর্মসূত্রে তাঁর দেখা দেশ বিদেশের গল্প বলতেন। অন্যান্য অনেক প্রসঙ্গই উঠে আসতো আলাপচারিতায়। বলতেন বিভিন্ন দেশের আচার আচরণ, ধর্মীয় জীবন এবং জীবনযাত্রার কথা। ব্রিটেন সহ ইউরোপের অন্যান্য অনেক দেশ, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ইত্যাদি বহু দেশ কর্মসূত্রে দেখেছেন তিনি। তিনি ছিলেন সহজ সরল সৎ প্রকৃতির মানুষ। তাই নিমেষেই জয় করতে পারতেন মানুষের হৃদয়। সব ঠাঁই সহজেই হয়ে যেতো তাঁর আপন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এসব পংক্তি বুঝি তাঁরই ক্ষেত্রে সুপ্রযোজ্য:

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া।
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়,
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া। উৎসর্গ ১৪

বস্তুত বরা ছিলেন কর্মবীর। অবসর গ্রহণের পরও ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি বিজ্ঞান সংক্রান্ত সেমিনারে বক্তৃতার জন্য বারংবার পেয়েছেন আমন্ত্রণ— অতি সম্মানীয় ব্যক্তি হিসাবে সেসব সেমিনারে হয়েছেন সমাদৃত। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ও বছর কয়েক আগে অতি গুরুত্ব পূর্ণ কাজে তাঁকে সাময়িকভাবে নিযুক্ত করে হয়েছেন উপকৃত। তিনি ছিলেন খুবই নির্মোহ প্রকৃতির মানুষ। কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর প্রাপ্তির পরও পেয়েছিলেন আরও বছর পাঁচেকের প্রসারণ। কিন্তু তা তিনি সবিনয়ে করেছেন প্রত্যাখ্যান। এত বড়ো পোস্টের মোহ ত্যাগ এ মস্ত বড়ো কথা। তাঁর মতো নমস্য ব্যক্তির পক্ষেই তা সম্ভব।

তিনি ছিলেন খুবই সত্যনিষ্ঠ পুরুষ। রাজনীতি থেকে থাকতেন হাজার মাইল দূর। ছিলেন খুবই আত্ম-সম্মান-আত্ম-মর্যাদা অনুধ্যায়ী মানুষ। তাই তাঁর ভাবমূর্তি যাতে চির অম্লান থাকে সেদিকে রাখতেন শ্যেন-দৃষ্টি কেননা তাঁর সুনাম সুযশের সুবিধে নেওয়ার অপচেষ্টা করতো অনেক সুযোগ সন্ধানী লোক। তাই কখনো স্মিত হাস্যে— কখনো তীক্ষ্ণ ধী-শক্তির জোরে উড়িয়ে দিতেন কুচক্রীদের স্বার্থ গোলা ভরা কামান।

তাঁর দেশ প্রেমও ছিল নিখাদ। দিল্লিতে যেদিন আমাদের সংসদ ভবন আক্রান্ত হয়েছিল বড়ই আহত হয়ে বলেছিলেন: 'হায়, জীবিত অবস্থায় এও দেখে যেতে হলো।'

রাত বারোটা অবধি পড়াশোনা করতেন। প্রতিদিন প্রাতঃস্নান সেরে প্রার্থনায় বসতেন। গৃহী সন্ন্যাসীর মতোই ছিল তাঁর জীবন। তাঁর ছিল খুবই সময় জ্ঞান। একনাগাড়ে আলাপচারিতা তাঁর ভালো লাগত না। সময়ানুবর্তিতা ছিল তাঁর মজ্জাগত। কথাবার্তাতেও অক্ষুন্ন থাকতো তাঁর অভিজাত্য বোধ।

একটু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ না করে পারছি না। তিনি আমার বাড়িতে এলে আন্তরিকভাবে খোঁজ-খবর নিতেন আমার সাহিত্যচর্চার। আমি লেখালেখির খবরাদি দিয়ে তাঁর মনোরঞ্জন করতাম। আমার বড়ো দুঃখ থেকে গেল তিনি জেনে যেতে পারলেন না কলকাতা থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'হাজার কবির হাজার কবিতা'য় স্থান পেয়েছে আমার কবিতা। জেনে যেতে পারলেন না দুই বাংলার প্রসিদ্ধ কবিতা পত্রিকা ইন্দ্রাণীতে ছাপা হয়েছে আমার গুচ্ছ কবিতা।

এই স্মৃতিকথা অসমাপ্ত থেকে যাবে মীরা বৌদির আত্ম-ত্যাগের কাহিনী অনুচ্চারিত থেকে গেলে। কী পরম নিষ্ঠায় মহিয়সী নারীর মতো রাতের পর রাত জেগে দিনের পর দিন কাছে থেকে তিনি সুদীর্ঘকাল পরিচর্যা করেছেন তার জীবন-সঙ্গী শ্রদ্ধেয় বরার। ইচ্ছা করে বলে উঠি, "মীরা বৌদি, আপনি মূর্তিমতী দয়া। ভারতের ঘরে ঘরে যুগে যুগে জন্ম নেন আপনার মতো কল্যাণীরা।"

ড. বরার মতো মহৎ ব্যক্তির বড়ো প্রয়োজন আমাদের ভঙ্গুর-ক্ষয়িষ্ণু সমাজে। তাই স্বামী স্বরূপানন্দের ভাষায় পুনর্বার আগমন কামনা করছি তাঁর মতো দুর্লভ ব্যক্তির। প্রার্থনা তাঁরই অশরীরী কণ্ঠে ধ্বনিত হোক:

আবার আসিব আবার হাসিব
আবার গাহিব গান।
শুধু বলিবারে পরহিত তরে
নিজের করহ দান।

৪.৬.২০০৪

কেন লিখি

প্রাণী মাত্রেই আত্মপ্রকাশের তাড়না অনুভব করে। পাখিরা বিচিত্র রকমের কাকলি করে— জন্তুরা বিভিন্ন রকমের ডাক ডেকে— মাছেরা, সামুদ্রিক প্রাণীরা জলের ভেতরে বিচিত্র রকমের খেলা করে— পতঙ্গরা বিচিত্র ধরনের নাচ নেচে— প্রজাপতিরা গুনগুন গান করে আত্মপ্রকাশ করে আনন্দ আহরণ করে। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষেরও সহজাত প্রবৃত্তি আত্মপ্রকাশ আনন্দ সংগ্রহ—বেদনা লাঘব। তাই কেউ কেউ নৃত্য করে— কেউ কেউ নৃত্য করে— কেউ কেউ গান গেয়ে— কেউ কেউ অভিনয় করে— কেউ কেউ সাহিত্য সৃষ্টি করে— কেউ কেউ চিত্র এঁকে— কেউ কেউ মূর্তি গড়ে— কেউ কেউ মন্দির মসজিদ প্রাসাদ নির্মাণ করে আত্মপ্রকাশ করে। উদ্দেশ্য আনন্দ প্রাপ্তি— বেদনা উপশম। অন্যান্য প্রাণী আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে আনন্দ সংগ্রহ করেই ক্ষান্ত, তবে মানুষ তার চেয়ে বেশি চায় তার শিল্পকর্মের জন্য। সে চায় অসংখ্য মানুষের শ্রদ্ধা ভালোবাসা— চায় সামাজিক সম্মান স্বীকৃতি, চায় চির অম্লান অমরতা। অজন্তা ইলোরা গুহার গায়ে অজ্ঞাত পরিচয় মানুষেরা অঙ্কিত করে গেছেন চিত্রাবলী— কোনারকে থাজুরাহে, এলিফেন্টায়, অজস্র মন্দির আর পাহাড়ের গায়ে রেখে গেছেন তারা ভাস্কর্যের অনুপম স্বাক্ষর। তাঁরাও চেয়েছিলেন বিশ্বলোকে থেকে যাক তাঁদের শিল্প সৃষ্টির অভিজ্ঞান;— অনাগত কালের মানুষেরা যেন জানতে পারেন তাঁদের ধ্যানধারণা, মনের খবর। আর এই ইচ্ছা থাকাটাই খুব স্বাভাবিক যেহেতু শিল্পসৃষ্টির জন্য প্রয়োজন অপরিমেয় রক্তক্ষয়। মনে হয় এই হাড়ভাঙা মানসিক শ্রমের বিনিময়ে অমরতার পারিশ্রমিক চাওয়াটাই অস্বাভাবিক কিছু নয়। এ আমিও লেখালেখির মাধ্যমে পাচ্ছি আত্মপ্রকাশজানিত আনন্দ— যুগপৎ হচ্ছি বেদনামুক্ত। লেখালেখি করে আমারও মন চায় মানুষের মন— তাঁর ভালোবাসা— চায় চিরকালের একটুখানি হাতছানি। তাই প্রায়শই গুঞ্জরন :

বিপুলা চ পৃথ্বী কাল নিরবধি। ভবভূতি

*　　*　　*

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
মধুহীন করো না গো　　তব মনঃ কোকনদে।
অমর করিয়া বর　　দেহ দাসে, সুবরদে!

ফুটি যেন স্মৃতি-জলে,
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শারদে

বঙ্গভূমির প্রতি, মধুসূদন দত্ত

* * *

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

প্রাণ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* * *

জীবনের কোন একটি ফলবান খণ্ডকে
যদি জয় করে থাকি পরম দুঃখে—
তবে দিয়ো তোমার মাটির ফোঁটার একটি তিলক আমার কপালে।
সে চিহ্ন যাবে মিলিয়ে
যে রাত্রে সকল চিহ্ন পরম অচিনের মধ্যে যায় মিশে।

পৃথিবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* * *

সৃষ্টির সিন্ধুর বুকে আমি এক ঢেউ
আজিকার; শেষ মুহূর্তের
আমি এক— সকলের পায়ের শব্দের
সুর গেছে অন্ধকারে থেমে;
তারপর আসিয়াছি নেমে
আমি;
আমার পায়ের শব্দ শোনো—
নতুন এ, আর সব হারানো-পুরোনো।

কয়েকটি লাইন, জীবনানন্দ দাশ

মজলিস সংলাপ অষ্টম সংখ্যা অগাস্ট২০০৫
সম্পাদনা : তুষারকান্তি সাহা, গুয়াহাটি

নীলমণি ফুকনের কবিতা

আধুনিক অসমীয়া কবিতার ভুবনে নীলমণি ফুকন নবতর সুরের সাধক। নতুন ধরনের প্রতীক আর চিত্রকল্প প্রয়োগে, ভাষা-বিন্যাসের নতুনত্বে, সঙ্গীতরসের উৎসর্জনে, কলাবৃত্ত ও গদ্যবৃত্তের নিপুণ ব্যবহারে এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতার উপস্থাপনায় নীলমণি অসমীয়া কবিতার জগতে অতুলনীয়। তাঁর কবিতায় আসামের প্রকৃতি উন্মোচিত, সমাজিক চেতনা ও ঐতিহ্য চেতনা বিধৃত। তাঁর কবিতার পটভূমি প্রকৃতি, প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে উন্মোচিত তাঁর মনোভূমি। রোমান্টিক মানসিকতা ও বিষাদময়তা তাঁর কবিতার অপর দু'টি বৈশিষ্ট্য।

নীলমণির মনোভূমি নির্মাণে চীনা কবিতা, জাপানি কবিতা, লোরকাসহ একালের বহু প্রতীচী কবির কবিতা ও জীবনানন্দ দাশের কবিতার ভূমিকা অনস্বীকার্য। এসব কবিতার ভুবনে পর্যটন করেই নীলমণির কবিতার ভাব, ভাষা, চিত্রকল্প আর প্রতীক হয়ে উঠেছে অনন্য। যদিচ প্রথম দিকে জীবনানন্দ ও পরে পাশ্চাত্য কবিতার জগতে পরিক্রমা করেই নীলমণি তাঁর রচনায় প্রতীক ও চিত্রকল্প প্রয়োগের প্রেরণা পেয়েছেন, এতৎসত্ত্বেও তাঁর প্রতীক ও চিত্রকল্প ব্যবহার সর্বত্র মৌলিক, সর্বথা নতুন। এ প্রসঙ্গে নীলমণির বয়ানেই শোনা যাক তাঁর কবিতায় কতখানি জীবনানন্দের উপস্থিতি "পঞ্চাশের দশকে জীবনানন্দ আমার খুব প্রিয় কবি ছিলেন। তাঁর প্রভাব পড়েছে সেই সময়ে লেখা 'স্বপ্ন বাসবদত্তা' কবিতায়। 'বনলতা সেন'-এর সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর...পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন' এই পঙ্‌ক্তি দু'টি পড়েই কিছুটা ধরতে পেরেছিলাম কবিতার ঋতু বদলের তাৎপর্য আর আধুনিক অভিধা। জীবনানন্দের কবিতা পড়েই প্রথম ধরতে পেরেছিলাম কবিতার আপাত-সরল রূপ, চলিত এবং গ্রামীণ ভাষার কাব্যিক সম্ভাবনার গূঢ় অভিপ্রায়। প্রধানত তাঁর প্রভাবেই আমার নিসর্গ চেতনা হয়ে উঠেছিল তীক্ষ্ণ, প্রাণবন্ত ও অনেক সংবেদনশীল। বিশ্বাস করেছিলাম উপমাই কবিতা। কবিতা ব্যাখ্যার অতীত, ব্যঞ্জনা বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে যায় কবিতায়।" হ্যাঁ, নীলমণির এ উক্তি তাঁর কবিতার প্রেরণার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ, তবে কিনা তাঁর প্রথম দিকের রচনাতেও—দুই একটি কবিতা ভিন্ন অন্যান্য রচনায় জীবনানন্দের উপস্থিতি দুর্লভ। আর তাই বলে রাখা ভালো জীবনানন্দের 'হায় চিল' কবিতায় যেভাবে উপস্থিত কবি ইয়েট্‌স্ বা 'বনলতা সেন' কবিতায় যেভাবে প্রধ্বিনিত এডগার এলেন পো-র কণ্ঠস্বর সেভাবে নীলমণির কোনো কবিতাই জীবনানন্দের দ্বারা আক্রান্ত নয়। তার কারণ জীবনানন্দের কবিতার ভাষা আর নীলমণির কবিতার ভাষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জীবনানন্দ প্রধানত মিশ্রবৃত্তে, কখনো-কখনো স্বরবৃত্তে এবং গদ্যবৃত্তে তার কবিতা রচনা করেছেন;

নীলমণি মুখ্যত অসম মাত্রিক কলাবৃত্তে, কখনো-কখনো গদ্যছন্দে তাঁর কাব্য সৃষ্টি করেছেন। আর তাঁর গদ্য কবিতায় অনুসৃত জীবনানন্দীয় বাক্‌স্পন্দ নয়, রাবীন্দ্রিক বাক্‌স্পন্দ। বলা বাহুল্য, ছন্দই নির্মাণ করে একজন কবির কণ্ঠস্বর এবং তাঁকে দেয় স্বাতন্ত্র্যের শিরোপা। সে কারণেই জীবনানন্দের কাব্যভাষা আর নীলমণির কাব্যভাষায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য। নীলমণি তাঁর কবিতা লেখেন কলাবৃত্তে তাই তাঁর শব্দাবলী ছড়ায় অন্য আলো, যা নয় জীবনানন্দীয়। আর স্থান কাল পাত্রের ব্যবধানে তাঁর কবিতা হয়ে ওঠে অনন্য। তাছাড়া জীবনানন্দ বাংলা ভাষার এমন একজন কবি যাঁর রচনাশৈলী অনুকরণীয়। প্রধানত চিত্রকল্পের পর চিত্রকল্প, উপমার পর উপমা প্রয়োগ করে তিনি নির্মাণ করেন তাঁর কাব্যভাষা। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' থেকে তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় কী বৈচিত্রময় কাব্যভাষা। তাঁর উপমা আর চিত্রকল্পের বাহার দেখে প্রায়শই মনে হয় তিনি বুঝি এযুগের কালিদাস, এযুগের বাণভট্ট। উপরন্তু জীবনানন্দের কাব্যজগতে ধৃত অতিব্যাপ্ত ইতিহাস চেতনা, অতিব্যাপ্ত বিশ্বচেতনা আর এক মহাবৈশ্বিক আলোকচেতনা। আর এসব অসাধারণ গুণাবলীর জন্যই জীবনানান্দ বাংলা ভাষা-সাহিত্যে প্রায় মহাকবি হিসেবে স্বীকৃত। আর তাই অনুকরণীয় তাঁর কাব্যভাষা—খোদ বঙ্গভূমিতেই তাঁর সার্থক উত্তরসূরি আজও দেননি দেখা। সুতরাং কবি নীলমণি ভালোই করেছেন জীবনানন্দকে আত্তীকরণ না করে—কেননা সম্ভব নয় জীবনানন্দকে স্বীকরণ।

স্প্যানিশ লোক-সঙ্গীত থেকে উপকরণ আহরণ করে লোরকা যেমন ঋদ্ধ করেছেন তাঁর কবিতার জগৎ, ভারতীয় লোক-সঙ্গীত থেকে উপাদান সংগ্রহ করে নীলমণিও তেমনি সমৃদ্ধ করেছেন তাঁর কবিতার ভুবন। জীবনানন্দের কবিতায় যেমন রূপ রস গন্ধ স্পর্শে আবির্ভূত বাংলার প্রকৃতি, লোরকার কবিতায় বর্ণ গন্ধ স্পর্শসহ যেমন উপস্থিত আন্দালুশিয়ার প্রকৃতি, নীলমণির কবিতায় তেমনি বিচিত্র বর্ণে গন্ধে উন্মীলিত আসামের প্রকৃতি। প্রকৃতির স্পর্শ পেয়ে চীনা কবিতা, জাপানি কবিতা যেভাবে হয়ে উঠেছে অসাধারণ, আসামের নৈসগির্ক সৌন্দর্যের স্পর্শ পেয়ে নীলমণির কবিতাও হয়ে উঠেছে অনন্য। নীলমণির কবিতায় আসামের পাখি গাছগাছালি বনভূমি, তার নদনদী প্রান্তর, তার পাহাড় পর্বত অবলীলাক্রমে উপস্থিত। আসামের প্রকৃতি হর্ষিত দুঃখিত আত্মীয়ের মতো বাঙময় তাঁর কবিতায়। কখনো কখনো আরব সাগর, উত্তরা-পথের প্রকৃতি ও মানুষ সুখী দুঃখী পরিজনের মতো উপস্থিত তাঁর কবিতায়। তাঁর অভিজ্ঞতার পটভূমি প্রকৃতি, প্রকৃতির পটভূমিতে উন্মোচিত তাঁর কবি সত্তা। এক-কথায় নিসর্গের আধারেই বিধৃত তাঁর কবিতার সৌন্দর্য মাধুর্য। নিসর্গ কীভাবে উপস্থিত তাঁর রচনায় তার কয়েকটি নমুনা :

ক. আঁশটে গন্ধের মেঠো পথ ধরে
রাত গায় জড়িয়ে আমি যাচ্ছি

খ. আবার আমরা ধুমায়িত রাতে
ধীরে-ধীরে নৌকো ছেড়ে দিলাম

গ. স্থির হলো মন
দাবানলে আধ-পোড়া
বদরী-পাতায়

ঘ. সবচেয়ে মধুর গান গায় যে গায়েন—
প্রত্যুষের স্বপ্নের মতো ওর স্বর,
ওর গানের প্রতিটি সূর্য প্রতিটি চাঁদ
রাঙা ফল গাছের ঝোপ-ঝাড়

ঙ. জলজ ঘাসে মূর্তার গাছে
সেখানে রেখেছে ঢেকে
সোনালি লেজের একঝাঁক মাছ

চ. পদ্মমণি পুকুরে মন্দ্রিত বাতাস
দেহে, তোমার দেহের ভিতরে
একটি রাঙা ফুল

তার মানে নীলমণির কবিতায় চিত্রকল্প সাধারণত আসামের প্রকৃতি থেকেই আহৃত এবং তাঁর কল্পনা প্রধানত প্রকৃতির সাহচর্যেই বিভাবতী।

সমাজ বাস্তবতা ও ঐতিহ্য চেতনা ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত নীলমণির কবিতায়। তীব্র প্রবল বাস্তব চেতনা ধ্রিয়মান তাঁর কবিতায়—তাঁর বহু কবিতার মর্মমূলে ধৃত ঐতিহ্য চেতনা। তাঁর কোনো-কোনো কবিতায় তীব্র প্রবল বাস্তবতা পাগলা ঘোড়া বা পাগলা হাতির রূপ ধরে বিপর্যস্ত মানুষের বিপন্ন অস্তিত্বের উন্মোচনে তৎপর। তাঁর বহু কবিতায় তীক্ষ্ণ ঐতিহ্য চেতনার স্বাক্ষর। তাঁর এই ঐতিহ্য চেতনা, এই বাস্তব চেতনা অসমীয়া তথা ভারতীয় তথা বৈশ্বিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে উন্মোচিত। নীলমণির কবিতায় রক্তস্নাত—অগ্নিস্নাত বাস্তব চেতনা, বিধৃত ঐতিহ্য চেতনা। তার কিছু নমুনা—

বাস্তব চেতনা :

ক. প্রত্যেকেই আমরা
নৈঃশব্দ্যের গড়া একটি মোমের মূর্তি

খ. একদল পাগলা ঘোড়ার কেশরে ঝুলে-থাকা
এক থোপা তুষার

গ. ছিন্নমূল গাছগুলি
জলে পড়ে আছে
নাকি সেই পাগলা হাতিটা
ঘর ভাঙে...
গরুগুলি হাম্বারব করে

ঘ. কেউ জানলো না ট্যাক্সিতে কে ছিল পরিকল্পিত
হত্যা অনেকক্ষণ পরও আকাশ ধোঁয়া-ধোঁয়া ছিল
জজ ফিল্ডে যুধিষ্ঠিরের বক্তৃতা ছেলেদের মাথায়
ব্যান্ডেজ কার্তিকের ছুটির দিন হাতি মাড়িয়েছিল
বরুয়া বাঘটা অর্ধাহারী মহিলাদের
স্তন কামড়ে জল চেয়েছিল জল পেট্রোল
পাম্পে আগুন

ঐতিহ্য চেতনা :

ক. হংসধ্বনি শুনেছি
রাত পোহাল না রাত হয়েছে

খ. কালিদাসের সাথে চর্মন্বতী
নদীতে নেমেছি

গ. ভুলে গেছি যদি ভুলে যেতে দাও
জলে ডুবে যাওয়া
হাওয়ায় আগুনে পোড়া
ভানতে দেবার কিছুই নেই হাতেই ঢেঁকিতে আঘাত করা
ধোই নে আর কাঁচা দুধ দিয়ে শালগ্রামের কালা

ঘ. রাতের বৃন্দাবন দিয়ে
যাচ্ছি

ঙ. বকুল মেলুক পাপড়ি
কৃষ্ণ জন্ম নেবেন আজ রাতে

নীলমণির বেশির ভাগ কবিতা কলাবৃত্ত (মাত্রাবৃত্ত) ছন্দে রচিত অসম মাত্রিক প্রবহমান মুক্তক। প্রধানত চার পাঁচ ছয় ও সাত মাত্রার সমাহারে রচিত তাঁর এসব কবিতায় দুই বা তিন মাত্রার সম্প্রসারণও লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। কলাবৃত্ত ছন্দের আধারে অসম মাত্রার মুক্তক রচনা করে তিনি অসমীয়া কবিতার ভুবনে সৃষ্টি করেছেন নতুন ধ্বনি-স্পন্দন। তাঁর 'এটি শিশুর সতে,' 'ইয়ার পরা কিমান দূর', 'ক'লৈ যাও হে'র উন্মাদিনী', 'মুঠি মুঠিকৈ কাটি তোর ঢেঁকীয়ার আঙুলি' প্রভৃতি কবিতা ও অন্যান্য বহু কবিতা চতুষ্কল, পঞ্চকল, ষটকল ও সপ্তকল পর্বের সমাহারে রচিত মুক্তক। নমুনা স্বরূপ মাত্রা বিভাজন সহ উদ্ধৃত হলো তাঁর সম্পূর্ণ একটি কবিতা :

এই যেন/প্রথম শুনিলোঁ/
ইমান নিজান/
করে/নাওরীয়া তই/

থর হ'ল/মন মোর/
বন-জুয়ে/আধা পোরা/
থেরেজু পাতত/
ভটীয়াই গ'লগৈ/চরা নাওখানি/
ভটীয়াই গ'ল/বেলি/
তোমার হেরোয়া/দুখত/

এই যেন/প্রথম শুনিলোঁ/সেই মাত/
ইমান নিজান/
নিজরে মাতত/
(এই যেন প্রথম শুনিলোঁ/গোলাপী জামুর লগ্ন)

আলোচ্য কবিতায় অসম মাত্রিক পর্বের বিন্যাসে চমৎকার সঙ্গীত-রস বা ধ্বনি-মাধুর্য সৃষ্টি করেছেন নীলমণি। এখানে বলে রাখা ভালো মাত্রাবৃত্তে রচিত তাঁর বহু কবিতা ছন্দিত গদ্য বা স্পন্দিত গদ্য বলে ভ্রম হয়। তার কারণ 'মাত্রাবৃত্তকে গদ্যের বাক্‌ভঙ্গির ছকে ফেলে নতুনভাবে বাজাবার' নৈপুণ্য তাঁর জানা। নীলমণি যে অসম মাত্রিক কলাবৃত্তে তাঁর অধিকাংশ কবিতা রচনা করেছেন তার কবিতার পঙ্‌ক্তিবিন্যাস ও ছন্দ-স্পন্দ তাঁরই সাক্ষ্য দেয়।

বরগীতের কবি শঙ্করদেব, মাধবদেব থেকে শুরু করে অসমীয়া ভাষার বিখ্যাত কবি নবকান্ত বরুয়াও এ ভাষার অন্যান্য অনেক কবি কলাবৃত্ত ছন্দে বহু কবিতা রচনা করেছেন। বাংলা ভাষাতেও এ ছন্দের ব্যবহার অনেক প্রাচীন। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে এ ছন্দে প্রথম 'লাইন ডিঙানো', প্রবহমানতা আসে। পরবর্তীকালে বাংলার বিখ্যাত কবি বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ এ ছন্দকে আরও সমৃদ্ধতর করেন। নীলমণির কবিতায় কলাবৃত্ত ছন্দ ব্যবহারের অন্তরালে এঁদেরও অবদান অনস্বীকার্য। কেননা তাঁর কবিতায় ছন্দ-স্পন্দ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত এঁদের কবিতার অনুরূপ। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'সিটমহল' কবিতাটি এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হলো। এই কবিতাটিতে অনেকাংশে উন্মোচিত নীলমণির কবিতায় ছন্দগত উৎস :

এক কবি।	৪/
তিনি পরতেন চুপি চুপি	২/৬/২/
লম্বা মেঘের পাজামা	৬/৩/
ঝড় ঝঞ্ঝায় ফুঁ দিয়ে	৬/৩
যখন ইচ্ছে বজ্রে	৬/৩
বাজাতেন তিনি	৬/
প্রকাণ্ড এক দামামা—	৬/৩

পৃথিবীকে তিনি ভালোবাসতেন খুবই	৬/৬/৩/
মাটিতেই তাঁর	৬/
ছিল পা	৩/
এক কবি।	৪
ছিল আকাশটা তাঁর টুপি	২/৬/২
সমুদ্রে তিনি শুতেন।	৬/৩/
আলো রাখতেন লুকিয়ে	৬/৩/
অন্ধকারের গর্তে।	৬/৩/
ভবিষ্যতকে	৬/
হাত বাড়িয়েই ছুঁতেন	৬/৩/
পৃথিবীও তাঁকে ভালোবেসেছিল খুবই	৬/৬/৩/
মাটি দিলো তাঁকে	৬/
শিরোপা।	৩/
ইট কাঠ ক্ষিদে তেষ্টার গায়ে গা দিয়ে	৬/৬/৩/
মাটির পায়ে পা বাধিয়ে	৬/৩/
কবিদের আছে	৬/
আলাদা একটা জগৎ	৬/৩/
স্বপ্ন যেখানে মাথা উঁচু করে	৬/৬/
বেড়ায়।	৩/
মাঝখানে শুধু দু'দিক বাঁচিয়ে	৬/৬/
বসে থাকে কাঁটাতারের বেড়ায়	৬/৬/
বাঁধা গৎ।	৪/

এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু অনূদিত 'জিভাগোর কবিতা' অন্তর্গত 'শীতের রাত্রি' কবিতাটি উদ্ধৃত হল। কলাবৃত্ত ছন্দে রচিত এই কবিতাটির অনুরূপ ছন্দ-স্পন্দ নীলমণিরও বহু কবিতায় অনুসৃত :

তুষার ছেয়ে দেয় পৃথিবী	৭+৩
সকল সীমা তার ছেয়ে দেয়;	৭+৪
টেবিলে জ্ব'লে যায় মোমের বাতি	৭+৫
টেবিলে জ্বলে যায়।	৭
যেমন ঝাঁকে-ঝাঁকে গ্রীষ্মে	৭+৩
আলোর দিকে ছোটে কীটেরা,	৭+৩

তেমনি জানালায় নিবিড় ভিড়ে	৭+৫
জমছে তুষারের পাপড়ি।	৭+৩
হাওয়ার তাড়া খেয়ে অঁকাছে	৭+৩
বৃত্ত, তীর ওরা জানালায়।	৭+৪
টেবিলে জ্ব'লে যায় মোমের বাতি	৭+৫
টেবিলে জ্ব'লে যায়	৭
আলোর উদ্ভাস সীলিঙে	৭+৩
পরস্পরে সংবিদ্ধ—	৭+৩
হস্ত, পদতল সেখানে ছায়া ফেলে,	৭+৭
এবং নিয়তির দ্বন্দ্ব।	৭+৩
শব্দ ক'রে দুটো জুতো	৭+২
চমকে প'ড়ে যায় মেঝেতে।	৭+৩
মোমের ফোঁটা-ফোঁটা অশ্রু ঝ'রে পড়ে	৭+৭
রাতের বাতি থেকে ঘাগরায়।	৭+৪
ধবলকেশ ঐ ধবল তুষারের	৭+৭
আঁধারে সব গেলো হারিয়ে।	৭+৩
টেবিলে জ্ব'লে যায় মোমের বাতি,	৭+৫
টেবিলে জ্ব'লে যায়।	৭
হঠাৎ কোণ থেকে ঝাপট হাওয়া	৭+৫
ফুঁ দিলো বাতিটার আগুনে,	৭+৩
তপ্ত প্রলোভন জাগলো দেবদূত,	৭+৭
পাখার ধৃত ক্রুশচিহ্ন।	৭+৩
ফেব্রুয়ারি ভ'রে বিরতিহীন	৭+৫
তুষার পৃথিবীকে ছেয়ে দেয়,	৭+৪
টেবিলে মাঝে-মাঝে মোমের বাতি জ্বলে	৭+৭
টেবিলে জ্ব'লে যায়।	৭

কলাবৃত্ত ছন্দের প্রতি নীলমণির যে মধুর পক্ষপাত তার অন্তরালে রবীন্দ্রনাথেরও আছে অবদান, কেননা অসমীয়া কবিতার জগতে প্রবেশের পূর্বেই কিশোর নীলমণি বহুবার রসাস্বাদন করেছেন 'গীতাঞ্জলি'র কবিতাবলী। ফলত কলাবৃত্তের ছন্দ-স্পন্দন প্রবাহিত হতে থাকে তাঁর অবচেতন মনে আর তা উত্তরকালে প্রভাবিত করে তাঁর কবিতা।

নীলমণি বেশ কিছু গদ্য কবিতাও লিখেছেন। তাঁর আগে অসমীয়া ভাষায় সার্থক গদ্য কবিতা লিখেছেন কবি যতীন্দ্রনাথ দুয়রা, হেম বরুয়া, মহেন্দ্র বরা, নবকান্ত বরুয়া প্রমুখ। তাঁর সমকালে গদ্য কবিতা লিখেছেন কবি বীরেশ্বর বরুয়া, হীরেন ভট্টাচার্য, অজিত বরুয়া ও নির্মলপ্রভা বরদলৈ। বাংলা ভাষার রবীন্দ্রনাথই সার্থক গদ্য কবিতার স্রষ্টা এবং তাঁর হাতেই এই ছন্দ প্রায় পূর্ণতা পায়। তাঁর পরে কবি জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, সমর সেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অরুণ মিত্র এবং অন্য অনেকে বাংলা ভাষায় অনেক উৎকৃষ্ট গদ্য কবিতা রচনা করেছেন।

অস্ফুট ছন্দে বা গদ্যে ছন্দে রচিত কবিতা বাক্-স্পন্দ বা বাক্‌পর্ব অনুসারে ছেদ বা বিরতির নির্ভর। অর্থাৎ গদ্য কবিতার নিয়ামক নিরুপিত ছন্দ নয়, অন্তর্নিহিত ছন্দ স্পন্দই তার নির্ধারক আর প্রস্ফুট কবিতার লাবণ্য এবং গদ্যের কাঠিন্য তার অন্বিষ্ট। তাই উৎকৃষ্ট গদ্য কবিতার ভাষা আবেগ বর্জিত—মননধর্মী।

নীলমণি ফুকনের গদ্যে লেখা কবিতা সাধারণত রবীন্দ্র প্রভাবিত। তাঁর গদ্য কবিতার বাক্-প্রবাহে প্রধানত অনুসৃত রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা ১', 'শিশুতীর্থ' ও 'পৃথিবী' নামের কবিতার বাক্-স্পন্দ। বলা বাহুল্য, নীলমণি বহু উৎকৃষ্ট গদ্য কবিতারও রচয়িতা। তাঁর গদ্য কবিতা প্রস্ফুট ছন্দে রচিত কবিতার লালিত্য ও গদ্যের সাবলীলতায় ঋদ্ধ।

কখনো-কখনো নীলমণি অন্য ভাষার কবিতা থেকে, বুদ্ধদেব বসু অনুদিত 'জিভাগোর কবিতা' থেকে স্বীকরণ করেছেন কবিতার পঙ্‌ক্তি। চমৎকার তাঁর এই আত্তীকরণ। তাঁর রচনার সাথে একাকার হয়ে গেছে তার স্বীকরণ।

নীলমণির কবিতায় স্মরণীয় পংক্তি ও সুভাষিতের অভাব। জীবনানন্দ দাশ বা নবকান্ত বরুয়ার মতো বিভিন্ন ছন্দে তিনি কবিতা রচনা করেননি। তবে স্মরণীয় পঙ্‌ক্তি বা বিচিত্র ছন্দে কাব্য রচনাতেই সীমাবদ্ধ নয় কবিকৃতি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বা নজরুল ইসলাম বিচিত্র ছন্দে কাব্য রচনাতেই সীমাবদ্ধ নয় কবিকৃতি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বা নজরুল ইসলাম বিচিত্র ছন্দে কাব্য সৃষ্টি করেও বড় কবির শিরোপা পাননি। একজন কবির সৃষ্টি রস-সঞ্চারে কতখানি সমর্থ এবং ভাষার পুনর্নির্মাণে কতখানি তাঁর দান তারই উপর নির্ভর করে তাঁর কবিকৃতি। বলা বাহুল্য নীলমণির কবিতা সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী এবং অসমীয়া ভাষার পুনর্নির্মাণে তাঁর ভূমিকা তাঁর গুরুত্বপূর্ণ। নবকান্ত বরুয়ার কবিতায় অসমীয়া ভাষার পুনর্নির্মাণের যে কাজ শুরু হয়েছিল নীলমণির কবিতায় তা এক চূড়ান্ত রূপরেখা পায়।

নীলমণি একজন বিশিষ্ট গীতকবি। কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি, তাঁর আনন্দ বেদনা, তাঁর জীবন যাপনের অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অণুরণিত হয় গীতিকবিতায়

আর তাই কল্পনা, সৌন্দর্য ও সঙ্গীতের পাখায় ভর করে করে রসসৃষ্টি। মন্ময় দৃষ্টিভঙ্গি আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে দীপ্ত গীতি কবিতায় বিচিত্র বর্ণে উন্মোচিত কবির কণ্ঠস্বর—তাঁর আত্মকথা ও স্বীকারোক্তি। আর গীতিকবিতা সাধারণত রচিত হয় প্রচলিত ভাষায়—আটপৌরে শব্দের বন্ধনে।

কবি হিসেবে গত একশো বছরের অসমীয় কবিদের পুরোভাগেই নীলমণি ফুকনের স্থান। এবং তাঁর সমকালের বা প্রায় সমসাময়িক দুই বাংলার বিশিষ্ট কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শ্যামসুর রাহমান, আল্ মাহ্মুদ, শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতোই অসামান্য তাঁর কবি-প্রতিভা স্বতন্ত্র তাঁর কবিতার জগৎ। আর তাই এদের কবিকৃতির সঙ্গেই তুলনীয় তাঁর কবি-কর্ম। অর্থাৎ এ কালে ভারতীয় ভাষায় কবি হিসাবে নীলমণির ভূমিকা নয় গৌণ। আর যথাযথভাবে অনূদিত হলে তাঁর কবিতা পৃথিবীর যেকোনো ভাষায় হবে সমাদৃত।

১৩, বিষ্ণুপথ
রুক্মিণীগাঁও
খানাপাড়
গুয়াহাটি-৭৮১০২২

প্রসঙ্গ : অনুবাদ

অসমীয়া ভাষার বিখ্যাত কবি নীলমণি ফুকনের কবিতার আমি একজন অনুরাগী পাঠক। প্রায় ত্রিশ বত্রিশ বছর ধরে পড়ে আসছি তাঁর কবিতা। তাঁর বহু কবিতাই আমার প্রিয়। তাঁর কবিতায় আসাম প্রকৃতির বাঙ্ময় প্রকাশ, তাঁর ভৌগলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক অনুষঙ্গ ওতপ্রোত। তাঁর কবিতার সাঙ্গীতিক মাধুর্য, আটপৌরে শব্দ ব্যবহারের ফলে তাঁর বাচনভঙ্গিতে প্রকাশিত অভিনবত্ব অর্থাৎ অসমিয়া ভাষার পুনর্নির্মাণে তাঁর দান, তাঁর প্রতীক চিত্রকল্প ব্যবহারের নতুনত্ব আমাকে মুগ্ধ করে। তাঁর কবিতায় শুধু শহুরে জীবন নয়— আসামের লোকজীবনও উপস্থিত। উপস্থিত সর্বভারতীয় ঐতিহ্য চেতনা। সবচেয়ে বড় কথা তাঁর বহু রচনা উঁচু মানের কবিতা। তাই তাঁর রচনা থেকে আমার প্রিয় কবিতাবলী মাতৃভাষা অনুবাদ করার প্রলোভন সংবরন করতে পারিনি—দীর্ঘদিন ধরে অনুবাদ কবে আসছি তাঁর কবিতা। এখন এই সব অনুদিত কবিতা নিয়ে একটি সংকলন করছি— নাম 'পড়োশি গোলাপ'। উল্লেখ্য ১৯৯৩ সালে 'আধুনিক অসমীয়া কবিতা', নামে বাংলা ভাষায় আমার একটি অনুবাদ গ্রন্থ বেরিয়েছিল। সেটি ছিল ১৯ জন বিশিষ্ট অসমীয় কবির ৮৮টি কবিতার বাংলা অনুবাদ। সে সংকলনটিতে নীলমণি ফুকনের ১২ টি কবিতা ছিল, কয়েকটি ক্ষেত্রে স্বল্প সংস্কার করে সেগুলি এ গ্রন্থে অন্তভুক্ত করা হয়েছে।

অসমীয়া এবং বাংলা লিপি প্রায় একই হওয়ায় এবং দু'টি ভাষার মধ্যে অনেক মিল থাকায় অনেকে মনে করেন অসমিয়া রচনার বাংলা অনুবাদ খুবই সহজ কাজ। বস্তুত তা নয়। কারণ দু'টি ভাষার কারক-প্রত্যয়-কাল- বিভক্তি-অনুসর্গ বা উপসর্গের প্রয়োগ-পদ্ধতি হুবহু এক নয়, বাক্যগঠন পদ্ধতিও ভিন্ন— শব্দভাণ্ডারও অনেক-অনেক স্বতন্ত্র। তাই অসমীয়া ভাষার রচনার বঙ্গানুবাদে চাই প্রচুর চিন্তাভাবনা, সাবধানতা এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। এ ভাষার রচনা থেকে ভাষান্তর ব্যাপারে একটি অন্তর্লীন অসুবিধাও আছে। তা হলো, এ যাবৎ প্রকাশিত অসমিয়া ভাষার অভিধানগুলিতে সংগৃহীত শব্দাবলীর বাইরেও, কারো-কারো মতে এ ভাষার শব্দাবলীর প্রায় অর্ধেকই অভিধানভুক্ত হয়নি। অনুবাদের সুবিধার জন্য (বুদ্ধিজীবীদের স্বার্থেও) মনীষী হেমচন্দ্র বরুয়া প্রণীত অসমীয়া ভাষার শ্রেষ্ঠ অভিধান 'হেমকোষ'-কেই আদর্শ করে (অর্থাৎ অসমীয়া, বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি প্রতিশব্দসহ) এ ভাষায় প্রচলিত তাবৎ শব্দ ভাণ্ডার নিয়ে দু'খণ্ডে বা তিন খণ্ডে একটি উৎকৃষ্ট অভিধান খুবই জরুরি। কেননা এই ব্যস্ততার যুগে সবসময় মূল লেখকের সঙ্গে অনুবাদকের যোগযোগ সম্ভব নয়। প্রধানত অভিধানের উপর নির্ভর করেই অনুবাদকর্ম সম্পন্ন করতে হয়। এছাড়াও প্রয়াত লেখকদের রচনার অনুবাদ তো উৎকৃষ্ট অভিধান ভিন্ন সম্ভবই নয়।

নীলমণি ফুকনের কবিতার অনুবাদ দুরূহ। অনেক পরিশ্রম করে করেছি তাঁর কবিতার অনুবাদ। তাঁর অনেক কবিতায় অসমিয়া ঐতিহ্য, আসামের ভূগোল, তার লোকসংস্কৃতি, তার ইতিহাস ওতপ্রোত। সেগুলি অনুবাদে মুখ খোলে না— ভাষান্তরে হয়ে পড়ে যান্ত্রিকতা আচ্ছন্ন। এ আমার অভিজ্ঞতা। তাই তাঁর সেই সব কবিতারই আমি বাংলা অনুবাদ করেছি যেগুলির বাক্ স্পন্দ, ধ্বনিমাধুর্য, ভাবভাষা, উপমা-উৎপ্রেক্ষা, প্রতীক, চিত্রকল্প ভাষান্তরেও থাকে প্রায় অক্ষুন্ন এবং অনুদিত কবিতাগুলি হয়ে ওঠে পুনর্সৃষ্টি।

'নীলমণি ফুকনের কবিতা' এই শিরোনামে আমার একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল কলকাতা থেকে প্রকাশিত কবি নির্মল বসাক সম্পাদিত কবিতার কাগজ 'ইন্দ্রাণী'র ২০০৩-এর পূজা সংখ্যায়। সেই রচনাটিই অল্পসল্প পরিমার্জনা করে 'পড়েশি গোলাপ' গ্রন্থটির ভূমিকা রূপে উপস্থিত করা হলো। এই পত্রিকাটিতে আমার অনুবাদে নীলমণি ফুকনের একগুচ্ছ কবিতাও বেরিয়েছিল ২০০৫-এর পূজা সংখ্যায়। অন্য একটি সংখ্যায় বেরিয়েছিল মদীয় ভাষান্তরে ১১টি অসমীয়া কবিতা। এইসব কারণে শ্রদ্ধেয় বসাককে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। গ্রন্থটি লিপিবিন্যাসে অনেক সহায়তা করেছেন সাহিত্য পত্রিকা 'মজলিশ সংলাপ'-এর সম্পাদক স্নেহাস্পদ তুষারকান্তি সাহা। এই জন্য তাঁকে অনেক সাধুবাদ জানাই।

অনুবাদ যাতে ত্রুটিমুক্ত হয় সেজন্য ভাষান্তরিত কবিতাগুলি নিয়ে শ্রদ্ধেয় কবি নীলমণি ফুকনের সঙ্গে বসেছি। এখন সহৃদয় পাঠকরাই করবেন তার বিচার।

১৩, বিষ্ণুপথ
রুক্মিণীগাঁও
খানাপাড়া
গুয়াহাটি-৭৮১০২২

পোয়েটস ফাউন্ডেশন এওয়ার্ড প্রাপ্ত কবির ভাষণ

শ্রদ্ধেয় সুধীমণ্ডলী,

২০০৭-এর পোয়েটস ফাউণ্ডেশন অ্যাওয়ার্ড পেয়ে আমি গর্বিত—আনন্দিত-সম্মানিত-ধন্য এবং অতি কৃতজ্ঞ। কখনও ভাবতে পারিনি করতলে আসবে এরকম উজ্জ্বল একটি মুহূর্ত। এ পুরস্কার পেয়ে আমি অন্য একটি কারণেও আনন্দিত। আমার মনে হচ্ছে, পুরস্কারটি আসাম থেকে বাংলা ভাষায় যাঁরা কবিতা লিখছেন তাদের প্রতিও এক প্রতীকী সম্মাননা।

প্রসঙ্গত বলি আমি যে আজ পোয়েটস ফাউন্ডেশন অ্যাওয়ার্ড পাবার যোগ্যতা অর্জন করেছি তার পেছনে কাজ করেছে কবিতার প্রতি আমার ভালোবাসা— তার প্রতি আমার দায়বদ্ধতা। কোনো উচ্চাভিলাস রোগে আক্রান্ত হয়ে জীবনে একটিও কবিতা লিখিনি কখনো মিথ্যাচার করিনি কবিতায়— আমার দেখা জগতই কল্পনার পাখায় ভর করে উঠে এসেছে আমার কবিতায়। যতটুকু সম্ভব পাঠ করেছি বাংলা এবং ইংরেজি ভাষার কবিতা— অনুবাদে পাঠ করেছি বিভিন্ন ভাষার কবিতা।

বৃহত্তর লিটল ম্যাগাজিন পরিবারেরই আমি একজন সাধারণ লেখক। গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে ছিলাম শিলংবাসী। সেখান থেকে বের করতাম 'শিলঙের কবিতা' ও 'ঋতুরঙ্গ' নামে দু'টি কবিতার কাগজ'। সে সময় এ দুটি পত্রিকা ছাড়াও লিখেছি অন্য অনেক লিটল ম্যাগাজিনে। পরবর্তী কালে এবং এখনো লেখালেখির ব্যাপারে লিটল ম্যাগাজিনই আমার প্রধান ভরসা।

কবিতার ভুবনে প্রায় একা হেঁটেছি পথ। তবে সাহিত্যের পথে সম্পূর্ণ একা চলা প্রায় অসম্ভব। আসাম আমার স্বভূমি হওয়ার সুবাদে কর্মস্থল শিলং এবং গুয়াহাটি থাকায় প্রচুর অসমিয়া কবিতার করেছি বাংলা ভাষান্তর। ('আধুনিক অসমীয়া কবিতা' এবং পড়োশি গোলাপ, নামে বাংলা ভাষায় আমার দুটি অনুবাদ গ্রন্থও আছে।) ফলে অসমীয়া কবিদের সঙ্গে গড়ে উঠেছে মধুর সম্পর্ক। এ ভাষার প্রধান কবি নবকান্ত বরুয়া এবং নীলমণি ফুকনের হতে পেরেছি স্নেহধন্য। নিজের কবিতা লেখার ব্যাপারে তাঁদের কাছ থেকে পেয়েছি প্রচুর উৎসাহ।

উত্তরাধিকার সূত্রেও পেয়েছি যথেষ্ট অনুপ্রেরণা। ঘটনাচক্রে আসামের বিখ্যাত পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য, ভূ-পর্যটক রামনাথ বিশ্বাস, ভক্তিগীতি রচয়িতা — সুগায়ক স্বামী চণ্ডিকানন্দ ছিলেন আমার ঘনিষ্ঠ স্বজন। শৈশব থেকেই মহোত্তম জীবনের অধিকারী এই সব পরিজন ছিলেন আমার আদর্শ। স্বল্প কবি-প্রতিভা থাকায় লেখালেখি করে তাদের পদাঙ্ক করেছি অনুসরণ।

স্থান : শিশির মঞ্চ, কলকাতা, ১৫.১২.২০০৮ (সন্ধ্যা)

প্রসঙ্গ : কবিতা

কবিতা কী? এই নিয়ে যুগে-যুগে কবিরা ভেবেছেন। নিজেদের মতো করে তাঁরা উত্তরও পেয়েছেন। তবে কবিতা কী তার সর্বসম্মত কোনো উত্তর মেলেনি। মনে হয় অন্ধজনের আলোক অনুভবের মতোই কবিতা নামের শিল্প।

দীর্ঘদিন ধরে কবিতা লিখছি। আমিও আমার মতো করে ভাবি কবিতা কী। এককথায় তার উত্তর খুঁজে পাই না। জাদুকরী কল্পনার সহায়তায় জীবন থেকে উত্থিত আমার আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ প্রকাশ করছি যে-মাধ্যমে তার ব্যাখ্যা আমি করতে পারি না, আমার কাছে গদ্যের মতো স্পষ্ট নয় তার অবয়ব— বড় ঝাপসা লাগে তার চেহারা। কল্পনার সহযোগেই দেখি তার মুখ— তার অবয়ব। আলো-আঁধারে আচ্ছন্ন থাকে তার অন্তরঙ্গ- বহিরঙ্গ। লিখি:

স্বপ্নলোকে
কালো জলে নীল জলে লাল জলে সাদা জলে
কবিতা কামিনী করে খেলা
মুখ তার দেখি যদি চোখ তার থাকে অন্তরালে
চোখ তার যদি দেখি চুল তার থাকে অন্তরালে
চুল তার দেখি যদি অঙ্গ তার থাকে অন্ধকারে।

অর্থাৎ হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতোই কবিতা নামের মাধ্যম। কল্পনার সহযোগেই দ্রষ্টব্য তার আত্মা। চেনা-অচেনায় যুগলবন্দি এই শিল্প স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে যেন রচনা করে সেতুবন্ধ। তার বহিরঙ্গ উন্মোচন অনেকাংশে হয়, আত্মা এক রহস্যলোকের মতো থাকে অধরা। হৃদয়ের কাছেই কবিতার আবেদন, সততা সহৃদয়-হৃদয়- সংবাদী কবিতা। সে কারণে অন্তরেই নিম্নোক্ত শ্লোকগুলি সুমধুর অভিঘাত:

ক. মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্। (বাল্মীকি)

খ. ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি। (বেদব্যাস)

গ. ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্-
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভুব কশ্চিৎ।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। (বেদব্যাস)

কবিতা কী এ-ব্যাপারে ভারতীয় আলঙ্কারিকদের অভিমত অতি সংক্ষেপে এখানে প্রণিধানযোগ্য। তাঁরা বলেন:

ক. বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।

খ. ধ্বনি: কাব্যস্য আত্মা।

গ. রীতিরাত্মা কাব্যস্য।

অর্থাৎ রসাত্মক বাক্যই কাব্য, ব্যঞ্জনা বা ব্যাঙ্গার্থ কবিতার প্রাণ। রচনারীতিই কবিতার আত্মা। আর এ-যুগের বিখ্যাত কবি-সমালোচক টি. এস. এলিয়ট বলেন: Poetry communicates before it is understood. এইসব উপাদান ভালো কবিতায় সর্বদাই প্রচ্ছন্ন থাকে।

কথা হচ্ছে, দূর অতীতে যখন প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের কোনো ভুবনেই আলঙ্কারিকদের আবির্ভাব হয়নি, তখনও কবিতা হয়েছে, এখনও কবিতা রচিত হচ্ছে। তখনকার দিনে তো প্রশ্নই ওঠে না, এ যুগেও আলঙ্কারিকদের বক্তব্য মাথায় রেখে কিংবা কাব্যালোচানার সারাৎসার মিলিয়ে কোনো প্রকৃত কবি কাব্য রচনা করেননা। কবি কাব্য সৃষ্টি করেন এক গভীর অর্থযুক্ত ভাষায়— এবং তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ-শৃঙ্খলার মাধ্যমে। নিজের মতো করে এক ইঙ্গিতময় ভাষায় প্রকৃত কবি রচনা করেন তাঁর কাব্য— আলো-আঁধারি শব্দ বিন্যাসে অভিনব হয়ে ওঠে তাঁর রচনা। যুগপৎ উপমা-উৎপ্রেক্ষা, ধ্বনিতরঙ্গ ইত্যাদি ইত্যাদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে উঠে আসে তাঁর কবিতায় যা কিনা আরোপিত বা প্রক্ষিপ্তি নয় তাঁর রচনায়। এ-সব কিছুর সমাহারেই একজন যথার্থ কবির রচনা হয়ে ওঠে রসাবৃত ব্যঞ্জনাঋদ্ধ। নিরাভরণ ভাষায়ও রচিত হয় কবিতা— বাইশ বাঁও জলের মতোই সে-রচনা গভীর। আটপৌরে শব্দবলীর মোড়কে রচিত সে-সব কবিতা উন্মোচিত হয় না— অন্তর্লোকে আভিঘাত।

শব্দ -অর্থ ও ধ্বনিতরঙ্গের সমন্বয়ে রচিত হয় কবিতা। ভালো কবিতার ব্যঞ্জনা সাগরের মতো অতল—বিস্তার তার দিগন্তের মতো। তাই কবিতার অর্থ অন্বেষণ না-করে তার মাহাত্ম্য অনুভব করাই সংগত। কবিতা এ রকম হবে— কবিতা সে-রকম হবে— এটা কবিতা— ওটা কবিতা এমন কোনো পদ্ধতিতে কবিতার বিচার করা সম্ভব নয়— কেননা কবিতা নামের শিল্প ব্যাখ্যার অতীত। ভালো কবিতা মানেই কল্পনার জাদুস্পর্শে অভিজ্ঞতার বাঙ্ময় প্রকাশ— সৌন্দর্য সৃষ্টি করে আনন্দ দান করাই কবিতার ধর্ম। একটি ভালো কবিতার রচনাভঙ্গি অর্থাৎ প্রকাশভঙ্গি বা স্টাইলের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি, কেননা বলার ভঙ্গিই স্পষ্ট করে দেয় একজন কবির বৈশিষ্ট্য— তাঁর স্বাতন্ত্র্য, যা কিনা তাঁর রচনার রসাস্বাদনে পাঠককে করে আকৃষ্ট। কবিতা যেমন ব্যাখ্যার অতীত, তেমনই প্রকাশভঙ্গি কী বস্তু তা-ও বিশ্লেষণ করা অসম্ভব। প্রকাশভঙ্গির জোরেই কবিতা হয়ে ওঠে অলঙ্কৃত—

ধ্বনি- তরঙ্গিত— স্মরণীয় তথা সর্বকালীন। ইঙ্গিতময় ধ্বনিতরঙ্গযুক্ত ভাষায় রচিত শিল্পমাধ্যমই কবিতা— প্রকাশভঙ্গিতেই হরপার্বতীর মতো একাত্ম তার স্বরূপ। নীচে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা গেল, শুধু প্রকাশভঙ্গির গুণেই যে-সব পঙ্‌ক্তির সৌন্দর্য পান করে আমরা অভিভূত, বিশ্লেষণে ধরা পড়ে না সে-সব পঙ্‌ক্তির মাহাত্ম্য।

ক. কাআ তারুবর পঞ্চবি ডাল
চঞ্চল চিএ পইঠা কাল। (লুইপাদ)

খ. কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর-লহরী মানা। (বিদ্যাপতি)

গ. যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই—
যা দেখেছি, যা পেয়েছি, তুলনা তার নাই।
এই জ্যোতিসমুদ্র মাঝে যে শতদল পদ্ম রাজে
তারি মধু পান করেছি, ধন্য আমি তাই।
যাবার দিনে এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ঘ. মনে পড়ে কবেকার পাড়াগাঁর অরুণিমা সান্যালের মুখ;
উড়ুক উড়ুক তারা পউষের জ্যোৎস্নায় নীরবে উড়ুক
কল্পনার হাঁস সব; পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রং মুছে গেলে পর
উড়ুক উড়ুক তারা হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর। (জীবনানন্দ দাশ)

ঙ. মেঘলা দিনে দুপুর বেলা যেই পড়েছে মনে
চিরকালীন ভালোবাসার বাঘ বেরুলো বনে...
আমি দেখতে পেলাম, কাছে গেলাম, মুখে বললাম: যা
আঁখির আঠায় জড়িয়েছে বাঘ, নড়ে বসছে না। (শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

চ. Here we go round the prickly pear
Prickly pear prickly pear
Here we go round the prickly pear
At five o'clock in the morning. (T.S. Eliot)

খনন, বর্ষ ২৪, সংকলন ২৭, দেবীপক্ষ
আশ্বিন ১৪১৬, সেপ্টম্বর ২০০৯
সম্পাদনা : সুকুমার চৌধুরী
নাগপুর– ৪৪০০২৩

কবিতা নানান রকম

গদ্যে বা ছন্দে রচিত ব্যঞ্জিত লেখার নামই কবিতা। রস সৃষ্টি করে সহৃদয় হৃদয় সংবাদী হয়ে ওঠাই তার প্রধান ধর্ম। অন্যভাবে বলা যায়, সৌন্দর্য সৃষ্টি করে আনন্দদান করাই কবিতার স্বধর্ম।

সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-অপ্রেম, বিষাদ-বিরহ কল্পনার পাখায় ভর করে উঠে আসে কবিতায়। ঈশ্বর মৃত্যু বিশ্বরহস্য প্রকৃতি রাজনীতি যুদ্ধ সমাজ বাস্তবতা এসব বিষয়ও কল্পনা-বিভার সহযোগে বাঙময় হয়ে ওঠে কবিতায়।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মতো কবিতাও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে দীপ্যমান। বিষয় যাই হোক, কবিতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কথা, রচনাকে কবিতা হয়ে উঠতে হবে অর্থাৎ নান্দনিক বৈশিষ্ট্য— ব্যঞ্জনার প্রাচুর্যে— কল্পনা প্রতিভার আবির্ভাবে— অনুববের গাঢ়তায় এবং চিরকালীন আবেদনে রচনাটি হতে হবে রসসঞ্চারী বা সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী।

প্রধানত গদ্য ছন্দে লেখা হচ্ছে সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা। সমাজ চেতনা তার মুখ্য বিষয়। আমাদের সাহিত্যের বৃহত্তর স্বার্থে প্রয়োজন বাংলা ভাষায় প্রচলিত প্রতিটি ছন্দে কবিতা লেখা— অপরাপর বিষয়েও কবিতা রচনা করা। কেননা বহু-ব্যবহারে ক্লিশে হয়ে গেছে গদ্য ছন্দ। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রে অনুজ্জ্বল গদ্য কবিতায় প্রায়শ লক্ষিত একই ধরনের ভাষা ব্যবহারের দুর্মর দৌরাত্ম্য। ব্যঞ্জনা-কল্পনাপ্রতিভা-সৌন্দর্যচেতনা এবং অনুভবের গাঢ়তার অভাবে এসব রচনার সিংহভাগই পদ্যকারে প্রতিবেদন।

সবিনয় নিবেদন, আমাদের ভাষার প্রতিটি ছন্দে লেখা হোক কবিতা। সব ধরনের অনুভবে আক্রান্ত হয়ে রচিত হোক কবিতা নামের রচনা। বিচিত্রতাই কবিতার অন্বিষ্ট। এ পথেই বাংলার কবিতার মুক্তি। আমাদের কবিতার ঐতিহ্যকে হৃদয়ে রেখেই হাঁটতে হবে পথ।

কবিপত্র ৫২ বছর
শারদীয় সংখ্যা ১৪১৬-২০০৯
স. পবিত্র মুখোপাধ্যায়
কলকাতা- ২৬

কবিতা কল্পলতা

প্রত্যেক কবি চায় আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তার কবিতা লিখতে বা তার কাব্যলক্ষ্মীর রূপাঙ্কন করতে, তবে কিনা তার কবিতা— তার কবিতা-কামিনী মর্তের ধূলায় নির্মিত কলমে অনেকটাই তার মতো করে সাড়া দেন না; তিনি থেকে যান অনেক অধরা-অছোঁয়া। এ কবি মাত্রেরই অভিজ্ঞতা। এখানে প্রণিধানযোগ্য মহত্তম কবি রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা। 'সোনার তরী' কাব্যের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' নামের কবিতায় ধরা পড়েছে এ-ব্যাপারে তাঁর অনুভব। এ কবিতায় রহস্যময়ী কবিতালক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে তাঁর উচ্চারণ।

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী।

বলো কোন্ পার ভিড়বে তোমার সোনার তরী। ... অর্থাৎ কবির কাছে কাব্যলক্ষ্মী বড়ই রহস্যময়ী। কবিকে তিনি কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাবেন কবি তা ধরতে পারছেন না। এক অজানারা দেশে— এক অবাঙ্মনসগোচর ভুবনেই যেন কবিকে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁর কাব্যলক্ষ্মী। এ অভিজ্ঞতা সব কবির। আলো আঁধারে নির্মিত কবিতার জগৎ— অতি রহস্যময় কাব্যলক্ষ্মীর বিচরণভূমি। তাই তো কবি জীবনানন্দ দাশ অন্ধকারে মুখোমুখি বসেন তাঁর কল্পনার হাঁস বনলতা সেনের।

সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬। কবি শামসুর রহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা বেরুচ্ছে। বইটির ভূমিকায় তিনি লেখেন— 'প্রায় পঁচিশ বছর ধরে বাগ্‌দেবীর পেছনে- পেছনে ছুটে চলেছি। কখনো তিনি আমাকে নিয়ে যান স্নিগ্ধ উপত্যকায়, প্রাচীন উদ্যানে, ঝর্ণাতলায়, সূর্যোদয়ে ঝলমলে টিলায়, কখনো বা তাঁকে অনুসরণ করতে গিয়ে পৌঁছে যাই চোরাবালিতে, তার মানে তাঁর কাছেও বাগ্‌দেবী বা কাব্য লক্ষ্মীর যাত্রাপথ খুবই ধোঁয়াশা আচ্ছন্ন— বড়ই রহস্যময়। তাঁর কাছে স্পষ্ট নয় তার চালচলন।

আর এই আমি, চল্লিশ বছর ধরে কবিতা লিখছি— কবিতার চরাচরে ভ্রমণ করছি, তবুও বুঝতে পারছি না কাব্যলক্ষ্মীর গতিবিধি— তার চলন-ধরন। অতি রহস্যময় লাগে তাঁর আচরণ। পদে-পদে অনুভব করি একজন কবি বা শব্দশিল্পীর পক্ষে সম্ভব নয় তার মনের মতো করে কবিতা রচনা বা তার কাব্যলক্ষ্মীর রূপাঙ্কন। সে-কারণে কবিতার দেবীর উদ্দেশ্যে লিখি।

অসীম অনন্ত নয় শব্দের ব্যঞ্জনা
শব্দ দিয়ে তিলোত্তমা তোমার নির্মাণ
সম্ভবে না, সীমাবদ্ধ ভাষার দ্যোতনা।

তোমার মোহন রূপ সনেটের ফ্রেমে বাঁধা সম্ভব নয়;...

তোমার মোহন রূপ শিল্পের আধারে বাঁধা সম্ভব নয়...

তবুও কবিতা লিখি, কেননা এতদিনে জেনে গেছি শুধু কবিতার জন্য আমার জন্ম। শুধু কবিতার কাছে আমি দায়বদ্ধ— কবিতা কল্পনালতা আমার প্রাণ— আমি কবিতালক্ষ্মীর পূজারি। তাঁর উদ্দেশ্যে তাই লিখি।

কবিতা কল্পনালতা নন্দন-কাননে তার বাস
স্বপ্নলোকে
কালো জলে নীল জলে লাল জলে সাদা জলে
কবিতা কামিনী করে খেলা
মুখ তার দেখি যদি চোখ তার থাকে অন্তরালে
চোখ তার দেখি যদি চুল তার থাকে অন্তরালে
চুল তার দেখি যদি অঙ্গ তার থাকে অন্ধকারে...

জীবন -সাহাহ্নে এসে জেনে গেছি অতি অধরা-অছোঁয়া এক শিল্পমাধ্যমের নাম কবিতা। কবি শঙ্খ ঘোষের ভাষায় কবিতা 'কল্পলতা'— রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কবিতা 'কল্পনালতা'। অতি রহস্যময় তার চলাফেরা। স্বপ্নলোকেই তার বাস। বছর এগারো মাসই তিনি নন্দন-বাসিনী।

সংবাদ লহরি
রবিবাসর
৩ জানুয়ারি ২০১০
প্রধান সম্পাদক : সুকুমার বাগচি
সম্পাদক : উদয়ন বিশ্বাস
শিলং-৪
গুয়াহাটি দপ্তর : গুয়াহাটি - ৫

শতবর্ষে বিষ্ণু দে

[বর্তমানে মুম্বাইয়ে ছেলের বাসায় আছি। হাতের কাছে বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা বা তাঁর অন্যান্য কবিতার বই নেই। পড়তে এনেছিলাম বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা'-র সংকলন খানি। মূলত এ গ্রন্থটিতে গৃহীত বিষ্ণু দে-র কবিতাগুলি পাঠ করেইএ নিবন্ধটি রচিত।]

বিষ্ণু দে বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ক্রেসিডা, ঘোড়সওয়ার, পদধ্বনি এবং ওফেলিয়ার মতো বহু উঁচুমানের কবিতার জন্মদাতা তিনি। বাংলা সাহিত্যে চিরকালীন তাঁর আসন— অতি শীর্ষে তাঁর স্থান।

অনেকের কাছে বিষ্ণু দে-র কবিতা দুরূহ বা দুর্বোধ্য। তাঁদের অভিযোগ, পাণ্ডিত্যের আগ্রাসনে তাঁর কবিতার বহু পঙ্‌ক্তি রসাস্বাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। সে কারণে, তাঁর বহু কবিতা বহু অনুরাগীর দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাষা থেকে স্বতন্ত্র ভাষা সৃষ্টির জন্য বিষ্ণু দে বহুক্ষেত্রে আবেগ বর্জিত কাব্যভাষা নির্মাণ করেন; এ কারণে, অনেক ক্ষেত্রে তাঁর কাব্য-পঙ্‌ক্তিতে কমা-দাঁড়িরও বহুল ব্যহার। ছন্দ দোলা— ধ্বনিমাধুর্যে অভ্যস্থ বাঙালির কান সে ভাষায় তেমন সাড়া দেয়নি বা তৃপ্তি বোধ করেনি। এ কারণেও তাঁর কবিতা বহুজনের অনুরাগ থেকে বঞ্চিত। অর্থাৎ দুর্বোধ্যতাই তাঁর কবিতার একমাত্র বাধা নয়। তবে বিষ্ণু দে অনধিগম্য কবি নন। তাঁর কবিতা খুব বেশি মনোযোগ দাবি করে, তার অন্তর্লোকে প্রবেশের একমাত্র পথ বারংবার অভিনিবেশ সহকারে তাঁর কাব্যপাঠ। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, প্রধানত প্রতীক চিত্রকল্পে রচিত সমস্ত আধুনিক কবিতা জলবৎ তরলং নয়, তার অন্তরঙ্গে প্রবেশের জন্য এ বিষয়ে অধ্যয়নও প্রয়োজন। সর্বোপরি, উৎকৃষ্ট কবিতার এক অনবদ্য আবেদন আছে— সম্পূর্ণ বোধগম্য না হলেও আনন্দ-দানে অব্যর্থ। আনন্দ-প্রাপ্তির জন্যই মহৎ কবিতা পাঠ প্রয়োজন।

কয়েকটি বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল বিষ্ণু দে-র কবিতা। এক, তাঁর সৃষ্টির অনেকখানি জুড়ে অনুপম চিত্রকল্প। সেসব চিত্রকল্প শিল্পগুণে আচ্ছন্ন করে। দুই, শুধু আবেগবর্জিত কাব্যভাষা নয়, ধ্বনিতরঙ্গে মধুর কবিতাও বিষ্ণু দে-র অন্বিষ্ট। তাঁর বহু শ্রুতিমধুর কবিতা মন্ত্রের মতো আবিষ্ট করে। তিন, যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ রবীন্দ্রনাথের হাতে চূড়ান্ত সিদ্ধিলাভ করেছে, সেই ছন্দকেই তিনি নিজের মতো করে বাজান অতীব নৈপুণ্যে এবং সেই ছন্দোবন্ধে মুগ্ধ হন পাঠক। (এ নিবন্ধে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে উদ্ধৃত তাঁর কিছু পঙ্‌ক্তি তারই উজ্জ্বল উদাহরণ)। চার, অজস্র সুভাষিত বা স্মরণীয় পঙ্‌ক্তির সমাহারে উজ্জ্বল বিষ্ণু দে-র কবিতা জগৎ। অতি প্রজ্ঞাপ্রসূত সে সব পঙ্‌ক্তি বাংলা সাহিত্যের

অমূল্য সম্পদ। পাঁচ, ভাবের দিক থেকে এ কালের নগর জীবনের প্রতিচ্ছবি তাঁর কবিতা। বহু রূপে প্রেম উপস্থিত তাঁর কবিতায়।

অনুপম চিত্রকল্প ব্যবহারে বিষ্ণু দে অতি দক্ষ। তাঁর অজস্র চিত্রকল্প ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-রূপরস গন্ধ-স্পর্শে করে আকর্ষিত। সে কারণে, পাঠক তাঁর চিত্রকল্পের সুষমা পান করে হন সম্মোহিত। তার কিছু নমুনা:

(ক) হালকা হাওয়ায় বল্লম উঁচু ধরো।
সাত সমুদ্র চৌদ্দ নদীর পার—
হালকা হওয়ায় হৃদয় দু-হাতে ভরো,
হঠকারিতায় ভেঙে দাও ভীরু দ্বার। (ঘোড়সওয়ার)

(খ) পাহাড়ের নীল একাকার হলো ধূসর মেঘের স্রোতে
পাঁচ পাহাড়ের নীল।
বাতাসেরা সব বাসায় পালালো মেঘের মুষ্টি হতে।
স্তব্ধ নিথর সাত সায়রের বিল। (ক্রেসিডা)

উল্লম্ফন বা দূরান্বয়ী চিত্রকল্পের জন্য বিষ্ণু দে-র কবিতা অনেক ক্ষেত্রে দুরূহ বা দুর্বোধ্য, সে কথা নয় অনস্বীকার্য।

মাত্রাবৃত্তে বা মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত বিষ্ণু দে-র বহু কবিতা আবেগ নিয়ন্ত্রিত; পাশাপাশি এ দু'টি ছন্দে লেখা তাঁর অনেক কবিতা ধ্বনি-তরঙ্গে মধুর— সেসব কবিতা শ্লোকের মতো আবিষ্ট করে— জাদুবৎ করে সম্মোহিত। অর্থাৎ ছন্দের হিল্লোলে— ধ্বনিমাধুর্যে বিষ্ণু দে-র অনেক কবিতা মহিমান্বিত। তার কিছু নমুনা :

(ক) লাল মেঘে ঠেলে নীল মেঘ, নীলে ধোঁয়া মেঘেদের ভিড়
মেঘে- মেঘে আজ কালো কল্কির দিন হলো একাকার।
বিদ্যুৎ নেভে ঈশাণবিষাণে, বজ্রও দিশাহারা।
এলোমেলো পাখা ঝাপটি তবুও ওড়ে কথা ক্রেসিডার (ক্রেসিডা)

(খ) মনে পড়ে, সে-দিনের ঝড়ে সে কী পদধ্বনি হুংকার, টংকার;
উৎসবের অবসরে।
আমাদের পলায়ন প্রেমের বিহ্বল বেগে, হে ভদ্রা আমার,
যাদবের পঙ্গপাল পিছে তাড়া করে,
পিছু- পিছু ছোটে পদধ্বনি,
ক্ষিপ্র কৃষ্ণ ব্যাজ রোষে, স্ফীতোদর হলধর ক্ষিপ্ত ধাবমান,
তোমার নিটোল হাতে উল্লসিত সে-তুরীয় যান,
দেশকাল সন্ততির পারে
অবহেলে করেছি প্রয়াণ। (পদধ্বনি)

বিষ্ণু দে নাগরিক কবি। তাঁর স্বপ্নের শহর কলকাতার ত্রিশঙ্কু জীবন উপস্থিত তাঁর কবিতায়। নগর জীবনের বিচিত্র রূপরেখাও ফুটে উঠেছে তাঁর কবিতায়। তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত নগর জীবনের কিছু রূপ:

(ক) ট্রাফিক থমকে দাঁড়ায়, হোঁচট খায়
বেতালা, বেসুরো, মিলের, কলের চোঙার ধোঁয়ায়
পল্টুনের ফাঁকে- ফাঁকে শিরশিরে হাওয়ায়
আলোয় ঝিকিমিকি জলস্রোতে।
জনস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান,
আশে আর পাশে, সামনে পিছনে
সারি-সারি পিঁপড়ের গান,
জানিনি আগে, ভাবিনি কখনো
এত লোক জীবনের বলি,
মানিনি আগে
জীবনের পথে-পথে এত লোক,
এত লোক গোপনসঞ্চারী
জীবন যে পথে বসিয়াছে জানিনি মানিনি আগে
পিঁপড়ের সারি
অগণন ভীড়াক্রান্ত হে শহর, হে শহর স্বপ্নভারাতুর। (টপ্পা-ঠুংরি)

(খ) বয়স হয়েছে ঢের, পেনশনই তো পঁচিশ বছর।
সবুজ সবুজ নদী আজ প্রায় নীলিমা ভাস্বর।
কর্ম সবই পশুশ্রম, চাকরি সে তো পেটের চাহিদা,
গর্বের বিষয় কম— কখনো নজর তথা সিধা
নিইনি, সান্ত্বনার তাতে যে টুকু এ- পঁচিশ বছর। (আইসায়ার খেদ)

বিষ্ণু দে-র কবিতায় 'প্রেম বহুরূপী'। বিচিত্র রূপে প্রেম উন্মোচিত তাঁর কবিতায়। প্রেম তার ছলাকলা, সৌন্দর্যমাধুর্য, নিষ্ঠুরতা, হঠকারিতা, ন্যাকামি-পাকামি নিয়ে পক্ষ বিধূনন করে তাঁর কবিতায়। সর্বোপরি তার প্রলয়ঙ্কর রূপ নিয়েও প্রেম উপস্থিত তাঁর কাব্যে। এ যুগের প্রেম-চেতনার বৈচিত্র্য উন্মোচনে প্রায়শ তিনি আশ্রয় নেন লোকপুরাণের। সে-কারণে পুরাণের পাত্রপাত্রীর আনাগোনা তাঁর কবিতায়। তিনি প্রত্যক্ষ করেন কেউ অমৃত-আধার হাতে, কেউ ঝঞ্ঝার করতাল বাজিয়ে কেউ হঠকারীর রূপ ধরে আসা-যাওয়া করে প্রেমের জগতে। তার প্রেমানুভবের কিছু নমুনা:

(ক) সোনালি হাসির ঝরনা তোমার ওষ্ঠাধরে।
প্রাণকুরঙ্গ অঙ্গে ছড়ায় চপল মায়া।
মুখর সে-গান ভেঙে গেলো। আর স্তব্ধ তমাল।
হালকা হাসির জীবনে কি এলো ফসলের কাল? (ক্রেসিডা)

(খ) মদির হাওয়ায় রজনীগন্ধার মতো
কেঁপে ওঠে রোমাঞ্চিত রাত্রির ধমনী।
ও কে আসে নীল জ্যোৎস্নাতে
অমৃত- আধার হাতে ও কে আসে... (পদধ্বনি)

(গ) হেলেনের প্রেমে আকাশে বাতাসে ঝঞ্ঝার করতাল।
দ্যুলোকে ভূলোকে দিশাহারা দেবদেবী।...
বৈশাখী মেঘ মেদুর হয়েছে সুদূর গগন-কোণে।
কুরুক্ষেত্রে উড়েছে হাজার রথচক্রের ধুলি।
স্বপ্ন- গোধূলি ডুবে গেলো খর-রক্তের কোলাহলে। (ক্রেসিডা)

(ঘ) এনেছিলে বটে হাসি।
মেঘের রেশমি আড়ালে দেখিনি
ব্রজের যাওয়া-আসা (ওফেলিয়া)

আমার চোখে রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার মহোত্তম কবি। কালিদাসের পরে ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর কবিতার বৈচিত্র্য, তার গভীর জীবনবোধ, তাঁর কবিতার দিগন্ত বিস্তৃত পটভূমি পাঠককে মুগ্ধ করে। তাঁর কবিতার বিচিত্র ছন্দ, তাঁর কবিতার মধুর সঙ্গীত, তাঁর ভাষার সৌন্দর্য মাধুর্য, তাঁর কবিতার রসমাধুর্য হৃদয় স্পর্শ করে— অনাগত কালেও হৃদয় স্পর্শ করবে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ঈশ্বর-প্রেম আর মানব-প্রেম একাকার— একই সূত্রে গাঁথা। বিশ্বপ্রেম আর মানব-প্রেম তাঁর কবিতার অন্যপ্রধান সুর। রবীন্দ্রনাথ আমাদের দীক্ষিত করেছেন ভালোবাসার মধুর মন্ত্রে। মানব-প্রেম, ঈশ্বর-প্রেম আর বিশ্বপ্রেম বিচিত্র রূপে ধ্বনিত তাঁর কবিতায়। তারই কিছু উজ্জ্বল উদ্ধার :

(ক) বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো। গীতাঞ্জলি

(খ) যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে—
সবার পিছে, সবার নীচে সব হারাদের মাঝে। দীনের সঙ্গী

(গ) হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন।
শক-হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন। ভারত তীর্থ

(ঘ) যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই—
যা দেখেছি, যা পেয়েছি, তুলনা তার নাই।
এই জ্যোতি সমুদ্র মাঝে যে শতদল পদ্ম রাজে
তারই মধু পান করেছি, ধন্য আমি তাই।
যাবার দিনে এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই। যাবার দিনে

(ঙ) সব ঠাঁই মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ লব যুঝিয়া। প্রবাসী

অনেকের অভিমত, রবীন্দ্রনাথের কবিতা অতীন্দ্রিয় প্রেম বা প্লেটোনিক লাভের চারণভূমি। বস্তুত তিনি শুধু অপার্থিব প্রেমের রূপকার নন; 'কড়ি ও কোমল'-এর অনেক কবিতা ছাড়াও তাঁর বহু কবিতায় দেহজ প্রেমের উজ্জ্বল উপস্থিতি, তাঁর বহু কবিতায় ছড়িয়ে আছে শরীরী প্রেমের অনবদ্য মাধুরী।

'মুখের এক পশের নিটোল রেখাটি দেখা যায়/ আর ঘাড়ের উপর কোমল চুলগুলি খোঁপার নীচে।'— পুনশ্চ

বিচ্ছিন্নভাবে এরকম হাজারো পঙ্‌ক্তির সোনালি আবেশ ছড়িয়ে আছে রবীন্দ্রকাব্যে। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা শুধুই অতীন্দ্রিয় অনুভবে জারিত নয়; কামনা বাসনা— রক্তমাংসের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসেও সুমধুর তার ভালোবাসার কবিতা।

অনেকে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ কবিতায় বাক্‌সংযমের অভাব লক্ষ্য করেন— লক্ষ্য করেন মিতভাষের সম্মিলিত রূপের অভাব। তাঁর অনেক কবিতা এ অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়—আবার তাঁর অনেক দীর্ঘ কবিতা এ অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। রবীন্দ্রনাথের অনেক দীর্ঘ কবিতা বাগাড়ম্বর, আবার তাঁর অনেক দীর্ঘ কবিতা মিতকথনের সমাহার। তাঁর 'শিশুতীর্থ', তাঁর 'পৃথিবী', 'অভিসার', 'পুনশ্চ' ও 'বলাকা'র বহু কবিতা অতি কথনে কল্লোলিত নয়— আদ্যন্ত শিল্প সুষমায় মণ্ডিত। তাঁর 'মানসী', 'সোনার তরী', 'কল্পনা' ও 'গীতাঞ্জলি'র বহু কবিতা মিতবাকের আলোয় মন্ত্রবৎ মুগ্ধ করে।

রবীন্দ্রনাথের অনেক দীর্ঘ কবিতা বাগাড়ম্বর, তা মিথ্যে নয়। কিন্তু তাঁর অনেক ছোট কবিতা কাব্যরসে-গীতরসে মনোভূমি অভিভূত করে। তাঁর 'স্ফুলিঙ্গ', 'কড়ি ও কোমল' এবং 'শেষ লেখা'র অন্তর্গত রচনাগুলি এত মিতবাক্ যে রসিক মাত্রকেই মুগ্ধ করে। তাঁর 'শেষ লেখা'র কবিতাগুলি অনবদ্য-অনুপম, বিশ্বসাহিত্যের দুর্লভ রত্ন। তাঁরই একটি কবিতা এখানে প্রণিধানযোগ্য:

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নতুন আবির্ভাবে—
কে তুমি?
মেলেনি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল।
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল
পশ্চিম সাগরতীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি?
পেল না উত্তর।

অনেকের অভিযোগ রবীন্দ্রনাথের কবিতা এ যুগের বার্তা বহনে অক্ষম। প্রশ্ন শুধু কি যুগের বার্তাবহনই একজন মহাকবির কবিকৃত্য, না, রবীন্দ্রনাথের মতো এক মহোত্তম কবির কাছে আমাদের প্রার্থনা অনেক বেশি তাই তো তিনি শোনান মহাজীবনের গান। আর সেক্ষেত্রে তিনি একশোভাগ সফল। তাঁর কবিতায় আমরা কান পেতে শুনি মহাজীবনের পদধ্বনি। তারই একটুখানি উজ্জ্বল উদ্ধার :

আকাশভরা সূর্য-তারা বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারই মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।।
অসীম কালের যে হিল্লোলে জোয়ার-ভাটায় ভুবন দোলে
নাড়িতে মোর রক্ত ধারায় লেগেছে তার টান
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান। —গীতবিতান

কবিতায় চাই সমাজ বাস্তবতায় প্রতিধ্বনি, চাই কবিতার বাস্তবতার রুনুঝুনুধ্বনি। কবিতার বাস্তবতা সতত দেশকাল নিরপেক্ষ। সমাজ বাস্তবতা বা সমাজ চেতনার মোড়কে এক বিশেষ দেশকালের রূপরেখা ফুটে ওঠে ঠিকই কিন্তু কবিতার বাস্তবতার মোড়কে ফুটে ওঠে এক অনিঃশেষ দেশকালের রূপরেখা। আর এই অনিঃশেষ দেশকালের মুখাবয়ব শুধু রচনা করতে পারেন কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথের মতো কবি। রবীন্দ্রনাথের সহস্র পঙ্‌ক্তি রক্তধারায় তোলে অনিঃশেষ দেশকালের অনুরনন। এখানে প্রণিধান যোগ্য তাঁর সেরকম কিছু পঙ্‌ক্তি :

(ক) পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম কস্তুরী মৃগসম।
ফাল্গুন রাতে দক্ষিণ বায়ে কোথা দিশা খুঁজে পাই না।
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।। —মরীচিকা

(খ) আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন পুণ্য করো দহন দানে।।
আমার এই দেহখানি তুলে ধরো,
তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো—
নিশিদিন আলোকশিখা জ্বলুক গানে।। গীতবিতান

তখন এক মহাকাল চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে আমাদের প্রাণমন। সমকালের ধূলিধূসরতা— কলুষ কালিমার ঊর্ধ্বে উঠে আসে এ জীবন। আর এখানেই রবীন্দ্রনাথে জয়। কথাটি একটুখানি বিস্তৃত করে বলি। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার সার্থকতম চিরকালীন কবি। চিরকালীনতা তাঁর সহস্র কবিতায় ওতোপ্রোত। সহস্রাধিক স্মরণীয় পঙ্‌ক্তির মণিমানিক্য তাঁর কবিতা। সে কারণে তাঁর কবিতার সত্যিকারের পাঠক তিনিই হতে পারেন যার মর্মমূলে মধুর ঝড় তোলে তাঁর সহস্র সুভাষিত— তাঁর কবিতার মহাকাল চেতনা, আর তাই দু'বাহু বাড়িয়ে বলতেই হয়— রবীন্দ্রনাথ সাধু সাধু।

রবীন্দ্রনাথের গান সম্পর্কে কিছু বলি। তাঁর গান শুধুই গান নয়— অতি রসোত্তীর্ণ কবিতা। তাঁর ছোট গল্প, তাঁর সংলাপ কবিতা, তাঁর ছিন্নপত্র বাংলা ভাষার মণি-মাণিক্য। তাঁর গোরা, তাঁর রক্তকরবী, তাঁর বিসর্জন আমাদের সাহিত্যের সম্পদ। বাংলা গদ্য কবিতাও তাঁরই হাতে পেয়েছে চরম উৎকর্ষ। এককথায়, রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকাননে মহাবৃক্ষ স্বরূপ— তাঁর দোসর এখনও অগোচর। এখনও তিনি সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক অনাগত কালেও থাকবেন প্রাসঙ্গিক।

কবিতা, কল্পনালতা

'কবিতা, কল্পনালতা' রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার নাম। সেই শিরোনামই রাখলাম আমার এ রচনাটির।

একটি ভালো কবিতা বা কাব্যাংশের রসাস্বাদ করে আমরা যখন আনন্দে বা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ি তখনই কবিতা হয়ে ওঠে সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী। প্রচ্ছন্ন ব্যঞ্জনার গুণেই কবিতা হয়ে ওঠে হৃদয়-গ্রাহী। ব্যাঙ্গার্থেই কবিতার আনন্দ-উৎস-সৌন্দর্য-মাধুর্য-রসমাধুরী। অর্থাৎ কবিতায় অনুসৃত ইঙ্গিতময়তা বা সাঙ্কেতিকতাই কবিতার আসল মাধুর্য।

কবিতা প্রগাঢ় অনুভব আর কল্পনার প্রভাবে রচিত শিল্প, সচেতনভাবে সৃজিত শিল্প নয়। জীবন থেকে উত্থিত অভিজ্ঞতা কল্পনা প্রতিভার স্পর্শে রূপ পায় কবিতায়। কবিতার ভাষা অনুভবের ভাষা, কল্পনাই তার প্রধান বাহন—বলা ভালো কল্পনারই সেখানে জয়-জয়কার। গীতিকবিতায় প্রধানত প্রকাশ পায় কবির আত্মকথা—অন্তর কাহিনী। সে কারণে, মহাকাব্যে লক্ষিত অনুকৃতির আনাগোনা গীতিকবিতায় কম—সেখানে কল্পনারই উজ্জ্বল উপস্থিতি। শুধু গীতিকবিতায় নয়, মহাকাব্যেও কল্পনার স্থান শীর্ষে। সে কারণে, মহাকবি মধুসূদন দত্ত অতি তাৎপর্যপূর্ণভাবে তাঁর 'মেঘনাদবধ' কাব্যের সূচনায় কল্পনা দেবীর উদ্দেশে উচ্চারণ করেছেন :

—তুমিও আইস, দেবী, তুমি মধুকরী
কল্পনা। কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

এ যুগের কবি শঙ্খ ঘোষও তাঁর কবিতায় কল্পনাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন :

কবিতা কল্পলতা আকুলা চঞ্চলতা
কবিতা সূর্যলতা হৃদয়ে চক্ষে জ্বলে।।

কবিতা অনুভবের বাঙ্ময় প্রকাশ। আর অনুভব কল্পনার পাখায় ভর করে কলম থেকে কবিতার আকারে ঝড়ে পড়ে। কল্পনাই নির্মাণ করে কবিতার বাক্‌প্রতিমা—তার আবির্ভাবেই কবিতায় উঠে আসে উপমা-উৎপ্রেক্ষা আর বিচিত্র সব অলংকার। যে ব্যাঙ্গার্থের গুণে কবিতা হয়ে ওঠে সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী সেখানেও কল্পনার উজ্জ্বল উপস্থিতি। অর্থাৎ কবিতা রচনায় কল্পনাই প্রধান পরিচালিকা শক্তি—কল্পনার সোনার কাঠির স্পর্শেই অঘটন-ঘটন-পটিয়সী কবিপ্রতিভা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে করে পাখাবিস্তার—কবিতা হয়ে ওঠে

সর্বত্রগামী—তাবৎ পার্থিব অপার্থিব বিষয় অনায়াসে আনাগোনা করে কবিতায়। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, ভয়-বিস্ময়, প্রেম-অপ্রেম, হিংসা-দ্বেষ ইত্যাকার বিচিত্র বিষয় অনুভব তাড়িত হয়ে কল্পনার পাখায় ভর করে উঠে আসে কবিতায়। কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা জাদুকরী কল্পনার স্পর্শে রূপ পায় কবিতায় তার কোনও লেখাজোখা নেই।

অসংখ্য বিষয়ে রচিত কবিতায় কল্পনার কী বিচিত্র আনাগোনা তার শুভারম্ভ করছি আধ্যাত্মিক সাধন সঙ্গীত চর্যাপদের একটি অংশ উদ্ধৃত করে। কল্পনার প্রতিভার স্পর্শেই এখানে অনুভব হয়ে উঠেছে এত ব্যঞ্জিত :

ভবণই গহণগম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী।।
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গার্টই।
পারগামি-লোঅ নির্ভর তরই।।

বৈষ্ণব কবিকুলও কল্পনার প্রভাবে কবিতাকে করেছেন অশেষ রসোত্তীর্ণ। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আর্বিভাব উপলক্ষে গোবিন্দদাস রচিত একটি পদ্যাংশ উদাহরণ স্বরূপ এখানে উদ্ধৃত হল। পদ্যাংশটি কল্পনা বিভার স্পর্শে প্রস্ফুট ফুলের মতো হয়ে উঠেছে সুন্দর :

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলকে-মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব।।

কি পেখলু নটবর গৌর-কিশোর।
অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনী-তীরে উজোর।।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কল্পনার জয় জয়কার। প্রাচীন ভারতের পটভূমিকায় রচিত তাঁর 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থটির পাতায়-পাতায় কল্পনারই আনাগোনা। কল্পনার নদীপথ ধরে সোনার তরুণী চড়ে প্রাচীন ভারতে কবি ভ্রাম্যমান। তাঁর ভাবভুবন কল্পনার বিচিত্র রঙে রঞ্জিত। তারই অনুপম প্রতিফলন তাঁর কবিতার উদ্ধৃত অংশে :

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা।
গুরুগর্জনে নীপমঞ্জরী শিহরে,

শিখীদম্পতি কেকাকল্লোলে বিহরে
দিগ্‌বধূচিত-হরষা
ঘনগৌরবে আসে উন্মদ বরষা

বাংলা ভাষার দিক্‌পাল কবি জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখও বহুবর্ণ কল্পনার দ্বারা চালিত হয়েই রচনা করেছেন তাঁদের কবিতা। জীবনানন্দ দাশ রচিত হাজার পংক্তি, কল্পনা-প্রতিভার স্পর্শে অত্যুজ্জ্বল মণির মতো করে ঝলমল। প্রাচীন ভারতের পটভূমিকায় রচিত তাঁর কয়েকটি পংক্তি এখানে প্রণিধানযোগ্য :

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূরে অন্ধকার বিদর্ভ নগরে;....
...চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবন্তীর কারুকার্য;...

মৃগীর মুখের রূপে হয়তো চিতারও বুকে জেগেছে বিস্ময়। এখানে কবির অনুভব যেন একটি কল্পমালিকা।

ক্ষণস্থায়ী প্রেমের মুগ্ধতার কল্পনার পাখা বিস্তারে সুধীন্দ্রনাথ দত্তেরর কবিতায় আসে এভাবে :

একটি কথার দ্বিধা থরথর চূড়ে
বাসা বেঁধেছিল সাতটি অমরাবতী;
একটি নিমেষে দাঁড়াল সরণী জুড়ে
থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি;

এখানে অনুভবে কল্পনার উজ্জ্বল উদ্ভাস। অবচেতনের অনেক গভীর থেকে যেন উঠে এসেছে পংক্তিগুলি।

বিষ্ণু দে-র কবিতায় কল্পনার উজ্জ্বল আনাগোনা। কল্পনার শীর্ষে আরোহণ করেই তাঁর ক্রেসিডা কবিতায় তিনি নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন সর্বকালের খণ্ডিত প্রেম। উদ্ধৃত পংক্তিগুলি কল্পনা প্রতিভার আলোকে দীপ্ততম :

হেলেনের প্রেমে আকাশে বাতাসে ঝঞ্ঝার করতাল
দ্যুলেকে ভূলোকে দিশাহারা দেবদেবী
... ...
বৈশাখী মেঘ মেদুর হয়েছে সুদূর গগন কোণে।
কুরুক্ষেত্রে উড়েছে হাজার রথচক্রের ধূলি।
স্বপ্ন-গোধূলি ডুবে গেলো খর-রক্তের কোলাহলে।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায়ও কল্পনা প্রতিভার আলোকিত আবির্ভাব। কল্পনার পাখায় ভর করে কী মধুর প্রেমস্পর্শে হৃদয় রাঙিয়ে দেন তিনি তারই উজ্জ্বল উদাহরণ :

ছোট ঘরখানি মনে কি পড়ে,
সুরঙ্গমা?
মনে কি পড়ে? মনে কি পড়ে?
জানালায় নীল আকাশ ঝরে
সারাদিনরাত হাওয়ার ঝড়ে
সাগর-দোলা,
সারাদিনরাত ঢেউয়ের তোড়ে
নাগর-দোলা,
আকাশ-মাতাল জানালা খোলা
দিগন্ত থেকে দিগন্তরে,
দিগন্ত-জোড়া সাগর ভ'রে
ঢেউয়ের দোলা।

গত শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে (বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির সুবাদে) বাংলা কবিতায় এল তীব্র তীক্ষ্ণ সমাজচেতনা। সাম্প্রতিক কালেও প্রধানত এ ধারাই প্রবাহিত বাংলা কবিতায়। তবে সমাজ চেতনা বা সমাজ বাস্তবতার নামে দৈনন্দিনতার যূপকাষ্ঠে উৎসর্গিত কবিতার সংখ্যাও নেহাত কম নয়। সমাজ বাস্তবতার রক্তচক্ষু দেখে অনেক-অনেক কবিতা থেকে পলাতক কল্পনা-বিভা। সাম্প্রতিককালেও যে ক'জন কবির রচনায় ঝলকিত কল্পনা প্রতিভা তাঁরা হলেন সমর সেন, অরুণকুমার সরকার, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, জয় গোস্বামী, শ্যামলকান্তি দাশ এবং অন্য কেউ কেউ। বিষয়ের তুলনায় রচনা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে সেজন্য ওঁদের থেকে মাত্র তিনজন কবিকে নিয়ে এ ব্যাপারে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করছি।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় ভালো পক্ষবিস্তার করে কল্পনা। তাঁর 'স্বর্গের পুতুল' নামের কবিতাটি কল্পনার জাদুস্পর্শে অনন্য। কল্পনার প্রভাবে দৈনন্দিনতাকে অতিক্রম করে পার্থিব জীবনেই কবি প্রবাহিত হতে দেখেন স্বর্গের তটিনী। (এ-ই কবিতার বিষয়) উদ্ধৃত অংশে তারই মধুর প্রকাশ :

ঘরের বাহিরে জ্বলে দৈব জলধারা,
দ্যাখ আলো জ্বলে, দ্যাখ আলোর তরঙ্গ জ্বলে, আলো
সকালে, দুপুরে, সারাদিন।
স্বর্গের তটিনী জ্বলে, আলো জ্বলে আলো
যেখানে দাঁড়াও...

কবি অরুণকুমার সরকারের কবিতা কল্পনা-বিভায় দীপ্ত। মোহিনী কল্পনার অভিঘাতে ছলা-কলা শাসিত নারীহৃদয়ের কী দারুণ উন্মোচন করেছেন অরুণ তাঁর একটি কবিতায় তারই একটুখানি নমুনা :

মেয়েদের ভালোবাসো না, মন,
প্রাপ্তি শুধু যন্ত্রণাই।
চটুল আঁখির ছলাকলায়
বীজাণু জটিল হৃদরোগের।
পিছনে জটিল হৃদরোগের
কান্নার ঢেউ বন্যা ঝড়।
বুঝবে কি রাজকন্যে কেউ
কেউ থরোথরো অশ্বক্ষুর?

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার ভুবনে বহুবর্ণ কল্পনা যেন ভ্রমণরত। জীবন-জিজ্ঞাসায় তাড়িত হয়ে কল্পনা বিভার কাছে সমর্পিত হয়ে শক্তি লিখেছেন তাঁর 'অবনী বাড়ি আছো'? নামের এক অসাধারণ কবিতা। পাঠক অবগাহন করুন এই কবিতার মন্দমধুর হাওয়ায় :

দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া
কেবল শুনি রাতের কড়ানাড়া
'অবনি বাড়ি আছো'?

বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস
এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে
পরাঙ্মুখ সবুজ নালিঘাস
দুয়ার চেপে ধরে—
'অবনী বাড়ি আছো'
আধেক লীন—হৃদয়ে দূরগামী
ব্যথার মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি আমি
সহসা শুনি রাতের কড়ানাড়া
'অবনী বাড়ি আছো'?

আবার বলছি কবিতা কল্পনালতা। কল্পনা প্রতিভার আলোর স্পর্শেই মহোত্তম কবিতা রচনা সম্ভব। কবিতার রাজ্যে অপরিহার্য কল্পনা। কল্পনা ছাড়া কবিতা সাধারণ রচনা। কল্পনা ব্যতিরেকে কবিতায় রামধনু রঙের স্পর্শ লাগে না—কবিতায় বেজে ওঠে না ঝঞ্ঝার করতাল—প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় না কবিতার। সাম্প্রতিক কালে কবিতায় কল্পনার পদছায়া বড় পড়ে না—সে কারণে কবিতা এখন মৃতপ্রায়। আসলে অগভীর অনুভবে স্বল্প আন্দোলিত হয়ে কিম্বা গদ্য লেখনের মতো পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে আজকাল অনেকেই লিখছেন কবিতা।

ফলে কবিতা তার চিরকালীন মাহাত্ম্য হারিয়ে সাধারণ গদ্যের মতোই এখন আকর্ষণহীন। কবিতা কল্পনালতা—সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী হয়ে ওঠাই তার স্বধর্ম।

প্রয়োজন কবিতার পুনরুজ্জীবন। সব ধরনের অভিজ্ঞতাই কল্পনা প্রতিভার স্পর্শে উঠে আসুক কবিতায়। জগৎ-সংসারের উনকোটি বিষয় উঠে আসুক কবিতায়। আর অনুভব-তাড়িত কবি কল্পনার আলোয় অবগাহন করে বিচিত্র বিষয়ে লিখুন কবিতা। প্রেরণা-প্রাণিত হয়ে হঠাৎ আলোর ঝলকানিতেই রচিত হোক কবিতা। সব কিছুর উপরে কল্পনা—কল্পনাই কবির তৃতীয় নয়ন—কল্পনার আলোকেই তাঁকে হাঁটতে হবে পথ। এভাবে কবিতা হয়ে উঠুক কবিতা—অবশ্যই কবিতা হয়ে ওঠার অন্যান্য শর্ত পূরণ করে।

উজ্জ্বল পাণ্ডুলিপি
পঞ্চমবর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা
বসন্ত ১৪১৭, মার্চ ২০১১
সম্পাদক : তমোজিৎ সাহা
শিলচর - ১

আড়ালের আমি

আমি কবি—এক শব্দশিল্পী। কল্পনার জাদুস্পর্শে আমার অনুভব—অভিজ্ঞতা প্রকাশ করি কবিতায় সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপনের জন্য। আমার অনুভব অভিজ্ঞতা সাধারণত আমি প্রকাশ করি সহজ সরল বাচনভঙ্গিতে। আমার মনে হয় অনাড়ম্বর ভাষাতে উঠে আসে জগৎজীবন সংক্রান্ত অনেক গভীর উপলব্ধি যা কিনা প্রতীকের প্রয়োগে সচরাচর হয়ে ওঠে না। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ এবং অনেক দেশি বিদেশি কবির কাব্য পাঠের অভিজ্ঞতদা আমাকে ঋদ্ধ করেছে। তাঁদের কবিতার জগতে প্রবেশ করেই আমার সম্যক উপলব্ধি হয়েছে জীবনের গভীর সত্য উন্মোচনে সহজ সরল ভাষার বিকল্প নেই—সহজ সরল ভাষাই কবিতা রচনার আদর্শ বাহন। এ ব্যাপারে মহোত্তম কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দু'চার পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করছি যা কিনা সহজ সরল ভাষায় রচিত কবিতার অনুপম উদাহরণ

যাবার দিনে এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই
যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই
এই জ্যোতি সমুদ্র মাঝে যে শতদল পদ্ম রাজে
তারই মধু পান করেছি ধন্য আমি তাই।

দীর্ঘদিন ধরে আমি কবিতার পাঠক। নিজেও লিখছি কবিতা। অভিজ্ঞতা থেকে বলছি কবিতায় চাই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্য। তার অস্থিমজ্জায় থাকবে স্বকাল চেতনা সহ মহাকাল চেতনা। মিতকথন, অনুপম চিত্রকল্প, বিচিত্র অলঙ্কারে রসমধুর হয়ে উঠবে কবিতা। পদ্যবৃত্তে বা ছন্দবৃত্তে—দু'টি বৃত্তেই রচিত হবে কবিতা তবে হরপার্বতীর মতোই একাত্ম হয়ে থাকবে তার ভাব ও ভাষা। প্রকাশ ভঙ্গি কবিতার প্রাণ ছন্দই কবিতার বাহন। আমার রচনায় কবিতার এসব বৈশিষ্ট্য কিছু পরিমাণে হলেও ধরা পড়েছে; এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।

প্যাপিরাস থেকে প্রকাশিত আমার 'নির্বাচিত কবিতা'র বইটি বহু পত্রিকায় আলোচিত হয়েছে। এসব আলোচনায় কেউ আমাকে সত্তর দশকের বুড়ো চণ্ডিদাস বলে চিহ্নিত করেছেন, কেউ আমাকে চিহ্নিত করেছেন আত্মমগ্ন কবি রূপে। কেউ চিহ্নিত করেছেন রোমান্টিক কবিরূপে। কেউ আমাকে সার্থক সনেট রচয়িতা বলেছেন কেউ আমাকে প্রধানত প্রেমের কবি কেউ আমাকে সত্তর দশকের এক প্রধান কবি বলেছেন। এসব আলোচনায় আমার কবিতার কিছু বৈশিষ্ট্য ধরা পড়লেও—এহ বাহ্য।

আমি মূলত রোমান্টিক কবি। আমার কবিতায় প্রেমের আঁধারে প্রস্ফুট সৌন্দর্য চেতনা। মৃত্যু চেতনা, জীবনরহস্য, প্রকৃতি, সমাজ বাস্তবতা ও ঐশী চেতনাও আমার কবিতার অন্যতম বিষয়। "প্রকৃতপক্ষে শিলঙেই আমার কবিতা বা কবিতাচর্চার সূচনা। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৮, এই ক'বছর, শিলঙে বসেই কবিতা রচনা করেছি। আমার প্রথম কবিতার বইয়ের (আসলে দ্বিতীয় কবিতার বইয়ের) দু'টি বাদে সব কবিতা আর দ্বিতীয় বইয়ের (আসলে তৃতীয় বইয়ের) প্রথম দিকের কবিতা শিলঙে বসেই লেখা।" এখানে এই তথ্যটুকু জানিয়ে রাখি, আমার প্রথম কবিতার বই ছিল যৌথ; সেকারণে এই গ্রন্থটির নাম আমি উল্লেখ করতাম না। কিন্তু পার্থ শর্মা লিখিত 'কবি রমানাথ : জীবন ও সাহিত্য, গ্রন্থ এই যৌথ কাব্যগ্রন্থটিতে প্রকাশিত আমার কবিতাগুলির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন; সে কারণে এই কাব্যগ্রন্থটি আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থরূপে এখন আমি উল্লেখ করি। গ্রন্থটির নাম হল 'অলিন্দে সূর্যের হাওয়া'।

"শিলঙের মাটি, তাঁর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের কাছে আমার কবিতা বহু ঋণী। তার ঘুম-ঘুম প্রকৃতির অলস আঁখিপাতে আমার কবিতার প্রথম জাগরণ। আমার প্রারম্ভিক রচনার অন্তরঙ্গে বহিরঙ্গে শিলঙের আলো-হাওয়া রোদের গুঞ্জরন। উপবন শহর শিলঙে থাকাকালীনই কবিতার নিভৃত লোকের সন্ধানে আমার যাত্রা—উন্মীলিত আমার কবিতা। কবিতায় এল প্রেম-অপ্রেম, আলো-অন্ধকার, মহাজীবনের ঘ্রাণ। শিলঙের জলপ্রপাতের মেঘগম্ভীর ধ্বনি, তার পাখিকুলের মধুর কাকলি, তার আকাশলোকে রূপালি-সোনালি-কাজল মেঘের আনাগোনা, মেঘ রৌদ্রের খেলা, তার পাইন বনানীর ঝুরুঝুরু হাওয়া, রংবেরঙের ফুলের বাহার, হাওয়ায়-হাওয়ায় উড়ে যাওয়া কুসুমের সুষমা, পাইনপাতার ঝরে-ঝরে পড়া, ঝরঝর বৃষ্টির মোহময় রূপ—ঝিরিঝিরি গান, সকালবেলার সোনালি গোলাপি রোদ, তার বিচিত্র শোভা এক মায়াবীর দেশে নিয়ে যেত মনপ্রাণ। এসব কিছুর নির্যাসেই রচিত আমার প্রথম দিকের কবিতা।"

(নির্বাচিত কবিতা/রমানাথ ভট্টাচার্য, মানিক দাসের নেওয়া সাক্ষাৎকার পৃঃ ১৯৫) আমার কবিতায় শিলং সহ আসামের রূপবতী প্রকৃতির নিত্য আনাগোনা। এ অঞ্চলের আমি বাসিন্দা। সে কারণে এখানকার নিসর্গ-প্রকৃতি আমাকে নিয়ত হাতছানি দিয়ে ডাকে—তার রূপরস গন্ধ স্পর্শে আমি উজ্জীবিত হয়ে উঠি। তার মধুর রূপ রূপসী নবীনার মতোই আমাকে মুগ্ধ করে। আমার কবিতার বই 'এবং পৃথিবী'র প্রায় সর্বত্র আসাম-প্রকৃতির উজ্জ্বল উচ্ছল উপস্থিতি।

১৯৭৯-এ আমার কর্মস্থল শিলং থেকে গুয়াহাটিতে নেমে আসে। সে সময় থেকেই আমার মতো করে অনুভব করে আসছি শহর গুয়াহাটির জীবনযাত্রা—তার প্রাণচাঞ্চল্য—প্রাণস্পন্দন। ধীরে ধীরে গুয়াহাটি শহর বিশাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু গ্রামের লোকজনের মতোই মহানগর গুয়াহাটির জীবনযাত্রা—এখানে একে অন্যকে বরণ করে নেয় অতি সহজে—যে কোনো বাড়িতে বেড়াতে গেলেই আতিথেয়েতার স্নিগ্ধ মধুর

হাওয়া। শহর গুয়াহাটি বিশাল হলেও অনন্য তার প্রাকৃতিক পরিবেশ—রাস্তার দু'পাশে প্রায় সর্বত গাছগাছালির স্নিগ্ধ মধুর আহ্বান—মহাবাহু ব্রহ্মপুত্রের নয়নহরণ কাজল জলের সুষমা জন্মান্ধকেও করে তোলে চক্ষুষ্মান। কামাখ্যা-ভুবনেশ্বর আর বশিষ্ট আশ্রমের প্রাকৃতিক দৃশ্য পান্থজনকে করে সতত সবুজে সিক্ত। সাধারণত জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্র, কখনো আশ্বিন মাসেও বর্ষরমুখর গুয়াহাটি তথা আসামের আকাশ—বর্ষণে-বর্ষণে প্রায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে জনজীবন—মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র তার উপনদীসহ ধারণ করে ভয়ঙ্কর রূপ। এসবের নির্যাস আসছে আমার কবিতায়—তার অন্তরঙ্গে। এতদসহ আমার কবিতায় যুক্ত হয়েছে বঙ্গীয় চেতনা। ওখানে আসামের প্রকৃতি বিষয়ক কিছু পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করলাম যাতে সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী পাঠক এ ব্যাপারে স্বল্প অবহিত হন। কেননা এ বিষয়ে আমার কবিতার আলোচকেরা প্রায় নীরব। উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তি কয়টি :

ক. নদীর দেশের লোক, আষ্টে-পৃষ্ঠে জল-জল-জল।
নদীর মোহন গানে রাতে ভাঙে দিনে ভাঙে ঘুম;
জলপরি গান গায় কুলুকুলু নিনাদের ঝুম;
জল বাড়ে পাড় ভাঙে, জলে-জলে চঞ্চল অঞ্চল।
জলে ভাসে ঘরদোর, ঘরে-ঘরে ওঠে আর্তনাদ।
জল বাড়ে, জলে-জলে জলে-জলে বিশাল সাগর;
একাকার বড় ঘর কুঁড়েঘর গ্রামগঞ্জ শহরনগর;
ঘরে ঘরে সকরুণ আর্তনাদ ভেঙে গেছে বাঁধ। (নদীর দেশের লোক)

খ. শ্রাবণের শুক্লা ত্রয়োদশী
আকাশে ডিম্বাকৃতি বেলুনের মতো চাঁদ
চাঁদের চারপাশে আশ্চর্য সুন্দর বলয়
বলয়ের চারপাশে কাটা-কাটা মেঘ
মনে হচ্ছে আকাশের গায়ে কে যেন লাঙল চালিয়ে গেছে (শুক্লা ত্রয়োদশী)

গ. ছলাৎ ছলাৎ শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায়
উড়য়া যাই শনবিলের পারে
জলজ ঘাসে স্ফটিক জলে মাছেরা খেলে
পাহাড় সবুজ ছায়া ফেলে ফটিক জলে,
পাহাড় জুড়ে আগুন জ্বলে পাহাড় জ্বলে কাজল জলে
কাজলা দিনে বিলের জলে ঢেউয়ের চলা
হাজার-হাজার হাতির খেলা
(ছলাৎ ছলাৎ শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায়)

আমার কবিতার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় প্রেম। অন্যান্য দশটি পুরুষের মতোই আমার কাছেও নারী ভালোবাসার পাত্রী। সে ভালোবাসায় অতীন্দ্রিয়তাও উপস্থিত। সাধারণত সে ভালোবাসা রূপজ কামজ বাতাবরণই সৃষ্টি করে। কারণ একটাই নারীর অনুপম সৌন্দর্য-মাধুর্য, তার আচরণে ব্যক্ত রহস্যময়তা পৃথিবীর সব পুরুষের মতো আমাকেও করে আকর্ষণ। কবি আমি সেকারণে নারী সংক্রান্ত এসব অনুভব কল্পনার পাখায় ভর করে কবিতায় রূপদান করি। তবে নারী আমার কাছে শুধু সৌন্দর্য-মাধুর্যের প্রতিমূর্তি নয়—তারও আছে বহু অমানুষিক গুণ—এসব অপগুণ দোষত্রুটি নিয়েও আমি কল্পনার সহায়তায় রচনা করি কবিতা; রচনায় প্রতিফলিত হয় তার ছলাকলা, তার স্বার্থপরতা, তার নিষ্ঠুরতা, তার সীমাবদ্ধতা। বহু রূপে প্রেম উপস্থিত আমার কবিতায়। আমার প্রেমের ভুবনে বৈধ-অবৈধ একাকার। ছোট মেসো আমার কবিতাহয় প্রেমিক পুরুষ—মন্দিরাদি বা গোপামাসী আমার কবিতার নায়িকা। প্রেমের ভুবনে অসঙ্গত নয় ব্যভিচার—সঙ্গত অসঙ্গত বলে প্রেমের ভুবনে কিছুই নেই। সে কারণে পরকীয়া প্রেম ঘুরে ফিরে আসে আমার কবিতায়। আমার এ অনুভব ষোলো আনা সত্যাশ্রিত। অনেকেই সৎসাগহের অভাবে এ ব্যাপারটার কাব্যরূপ দেন না—আমি নির্দ্বিধায় দিই। সমাজজীবনে রাতে আঁধারে দিনের আলোয় পরকীয়া প্রেম এক স্বাভাবিক ঘটনা—আমি তাই তার রূপ দিই কবিতায়।

বিরহ আমার কবিতার এক প্রধান সুর। বহু বেদনাবিধুর বিরহ কবিতার আমি স্রষ্টা। আমার কবিতার প্রেমিক প্রেমিকা সাধারণত বাস করে দূর থেকে দূরে-বহু দূরে। এই বিচ্ছিন্নতার যুগে প্রেমিক প্রেমিকা বহুক্ষেত্রে পরস্পর বিচ্ছিন্ন।

প্রেমের ওপরেও আমি লিখেছি কিছু কবিতা। বার-বার মনে প্রশ্ন জেগেছে প্রেম কি? আমার মতো করে খুঁজেছি তার উত্তর। জেনেছি প্রেম বহুরূপী। এখানে সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদীর জন্য উদ্ধৃত হল আমার প্রেমানুভূতি জাড়িত কিছু পঙ্‌ক্তি :

ক. রমণী বিচিত্র তালা
একশোবার ঘোরালে চাবি
খোলে সেই তালা
নারী এক আজব খেলনা। (রমণী বিচিত্র তালা)

খ. দৃশ্যত সুন্দর তুমি মন-জুড়ে হাজার কলুষ;
নিমেষেই ম্রিয়মান বহুবর্ণ প্রেমের জৌলুস (দৃশ্যত সুন্দর তুমি)

গ. একদিন ধবল জ্যোৎস্নার ঝড়ে নির্জন অরণ্যে তুমি ধরেছিলে হাত
জ্বলছিল স্নিগ্ধ হাসি একফালি তরুণ রোদ্দুর
নদীর ধ্বনির মতো ঝরছিল স্বর মিঠে স্বর
অন্ধকার বিভা হয়ে জ্বলছিল চুল নীল চুল
নীলিম আকাশ হয়ে জ্বলছিল চোখ
ও শরীর তরুজুড়ে ফুটেছিল সংখ্যাহীন খুশির কুসুম।
(নির্জন অরণ্যে তুমি ধরেছিলে হাত)

ঘ. সাধারণ তুমি সাধারণ
মিছেমিছি গাও স্বর্গীয় গান
ভালোবাসা তুমি ভালোবাসো না
তুমি ভালোবাসো বন্ধন জাল
সাধারণ তুমি সাধারণ। (সাধারণ তুমি সাধারণ)

ঙ. ঠোঁটে ঠোঁট মুখে মুখ দেহ পরে দেহ রেখে রোজ
অঙ্গরস পান করো দেহ নিয়ে খেলা করো রোজ;
জানতে চেয়ো না নর কখনো এ মনের খবর,
পর-পুরুষের প্রেম মনে জ্বালে খুশির আগুন;
পর-পুরুষের প্রেমে করতলে জ্বলে লাল চাঁদ;
মাথার উপর জ্বলে ঝলমল তারার বাগান;
সিঁদুরে মেঘের মতো রূপরাজ পরকীয়া প্রেম
ঝলমল রামধনু জ্বলে যেন মেঘলা আকাশে। (পর-পুরুষের প্রেম)

চ. একশো প্রেম করে আমি বেছে নেব আমার প্রেমিক।
লোকে যদি মন্দ বাসে বাসতে দেব। আমি আধুনিকা।
রাত্রিদিন প্রেম করে বেছে নেব উজ্জ্বল মানিক;
স্বয়ংবরা সভা ডেকে হব আমি কুলীন প্রেমিকা।
পুণ্যবতী কুন্তি তারা ইন্দুমতী আদর্শ আমার,
লোকে যদি মন্দ বাসে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করি না।
স্বয়ংবরা হলে কেউ সর্বজন বিমর্ষ অপার
গদাঘাতে স্তব্ধ যেন কেন নারী হবে না অধীনা।

বিশ্বরহস্য ও ঈশ্বর চেতনা উপস্থিত আমার কবিতায়। আমার ঈশ্বর বিষয়ক কবিতা নিরাকার ব্রহ্ম-উপলব্ধির ব্যাপার নয়। আমার ঈশ্বর কখনো মানুষের মতো চক্ষুস্নান, কখনো আলোকে-আলোকে মহালোকে তাঁর বাস, কখনো তাঁর মধুর স্পর্শে দেহমন উজ্জীবিত। তাঁরই ইচ্ছায় চন্দ্র সূর্য তারাবলি জ্বলে ওঠে মহাকাশে। তিনিই বিশ্বভুবনের নিয়ন্তা—চরাচরে তাঁরই উজ্জ্বল উপস্থিতি। অনুভূত হয় তাঁরই অঙ্গুলি-সঙ্কেতে নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি মানুষ—তাঁরই বন্দনা করছে মহাবিশ্ব। তাঁরই পদছায়া পাবার জন্য অন্তর করে অনন্ত ক্রন্দন। তিনি কারো কাছে গড, কারো কাছে তিনি আল্লাহ্, কারো কাছে তিনি ঈশ্বর। এভাবেই বিচিত্ররূপে ঈশ্বর উপস্থিত আমার কবিতায়। কিন্তু বিশ্বরহস্য বা ঈশ্বর চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রচিত কবিতা সম্পর্কে আলোচক সমালোচকরা প্রায় নীরব। সে কারণে এ দু'টি বিষয় নিয়ে রচিত কবিতার কিছু পঙক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি :

ক. এ দেশ মায়ার দেশ সবখানে খেলা করে মায়া;
সবখানে আলো-ছায়া মৃগতৃষ্ণা মেঘালোক খেলা;

এ দেশের সবকিছু ইন্দ্রজাল মায়াজালে ছাওয়া;
হাটে-ঘাটে সবখানে ইন্দ্রজাল মায়ামৃগ মেলা।
দৃশ্যত সুন্দর দেশ আসলে তা তমসা অপার।
সবখানে ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনু প্রচ্ছন্ন আঁধার। (সবকিছু ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনু)

খ. কেউ আছো জীবনের অর্থ বলে দেবে
কেন জন্ম কেন মৃত্যু কেন যাতায়াত
কেন প্রেম কেন ঘৃণা যুদ্ধ বারবার
জীবনের গায় কেন অমন কুয়াশা
কেউ যদি প্রান্ত দেখে মধ্য-লোক থেকে
যায় দৃষ্টির আড়ালে কেউ যদি ঊর্ধ্ব
দেখে অধঃলোক তবে আচ্ছন্ন আঁধারে
কেউ আছো জীবনের অর্থ বলে দেবে

গ. ঘর খুঁজি
খুঁজি আমার পৃথিবী
সবখানে ছায়া পড়ে অদ্ভুত বিদেশ
হাঁটতে থাকি
দেখি
মহানীলে আমার ভবন। (মহানীলে আমার ভবন)

ঘ. ঈশ্বর, তুমি কি দেখছো
ফুটপাতে ঊর্ধ্ববাহু হাজার মানুষ
দেখছে তুমি বাতাস-আহারী লোক
ড্রেন থেকে জঘন্য উচ্ছিষ্ট খেতে
পাশে তার হ্যাঁলা কুকুর (ঈশ্বর তুমি কি দেখছো)

ঙ. অন্ধকারে পড়ে আছি, পর্দা তুলে দাও বিশ্বপ্রাণ;
দিবারাত্রি প্রাণভরে দেখে নিই জ্যোতির্ময় রূপ;
সন্দেহের ধূলি ঝেড়ে দেখে নিই রূপ অপরূপ;
অবনত শিরে যেন অবগত হই মহীয়ান
তুমি যন্ত্রী, চরাচর যন্ত্র এক, বিশ্বমহাযান
তোমারই নির্দেশে চলে, আমি তুচ্ছ অনু মহাপ্রাণ।
(আমি তুচ্ছ অনু মহাপ্রাণ)

চ. আলোকে আলোকে বাস মহালোকে তোমার আবাস;
চরাচরে ফুটে আছে লক্ষ কোটি আলোর সরোজ;
আলোর সাগরে বাস, আলো দিয়ে মালা গাঁথো রোজ;

আলোকে আলোকে বাস তুমি রোজ তিমির-বিনাশ।
আলোর সাগরে বাস শিরস্ত্রাণ নীলিম আকাশ;
পদতলে লক্ষ কোটি নীল সিন্ধু হয় না গোচর;
করতলে লক্ষ কোটি বসুন্ধরা সবুজ উর্বর;
আলোকে আলোকে বাস মহালোকে তোমার আবাস।

(আলোর সাগরে বাস)

সমাজ বাস্তবতা ও রঙ্গব্যঙ্গ আমার কবিতার অন্য দুটি বিষয়। এ দু'টি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রচিত আমার কবিতায় ফুটে উঠেছে মানুষের সমূহ ভণ্ডামি—তার চূড়ান্ত স্বার্থপরতা, খুলে পড়েছে তার সার্বিক মুখোশ। স্বার্থপাগল মানুষ বিচিত্ররূপে কলুষ-কালিমার সঙ্গে করছে আপোষ। তাদের প্রাপ্য শুধু অগণন ধিক্কার। সমালোচগণ আমার ভালোবাসার কবিতাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে এ দু'টি বিষয়ে রচিত আমার কবিতা সম্পর্কে প্রায় নীরব। ফলে কবিরূপে আমার সামগ্রিক পরিচয়টাই আড়ালে বয়ে গেছে। সে কারণে সমাজ বাস্তবতা ও রঙ্গব্যঙ্গের অভিঘাতে রচিত আমার কবিতার কিছু পঙ্‌ক্তি এখানে উদ্ধার করছি :

ক. গর্ভিণী নারীর মতো ছোটে বাস
প্রতি স্টপে প্রসূতি ও অন্তঃসত্ত্বা।
দৃষ্টির আড়ালে রক্তপাত,
একদিন হেঁটে ঘুমন্ত গ্যারেজে
সন্তান সন্ততি অন্ধ
রাতের বাতাস খেয়ে শব্দহীন গাছ। (শব্দহীন গাছ)

খ. রাজা ভালোবাসো
ভালোবাসা ভিন্ন তুমি অন্তরীণ
আকাশে অমৃত
মুক্তি ঘাস, নির্বাণ পাথর। রাজা ভালোবাসো। (রাজা ভালোবাসো)

গ. আমি তো আঘাত দিই নিই রোজ সহিংস ভূমিকা
গড়ে নিতে মঞ্জুনীড় অহিংস পৃথিবী। (তলোয়ার নিয়ে ঘুরি)

বা

সভ্যতা নষ্ট মেয়ে, তোমাকে চুবিয়ে মারবো দরিয়ার জলে।
অবিরাম দেখে-দেখে তোমার হিংস্র রূপ অগ্নিদাহে মরি;
সর্বদাই ইচ্ছা করে তোমাকে হনন করে প্রলয় নাচন
নাচি শম্ভুর মতন; সভ্যতা নষ্ট মেয়ে তোমার শরীরে
সদা রক্ষ-রক্ত বয়, তাই তুমি এত ভণ্ড এত হিংস্র রোজ;
নখের আঁচড়ে ছিঁড়ে মানুষের হৃৎপিণ্ড বাজাও দামামা;

নর-নারী রূপ ধরে পথে-পথে চলে তোর রোবট-বাহিনী;
সভ্যতা নষ্ট মেয়ে, তোমার মৃত্যু হলে গঙ্গাজলে স্নান। (সভ্যতা নষ্ট মেয়ে)

ঘ. রুদ্রসাহেব দারুণ ভদ্র লক্ষ্মী পেঁচা
মেয়ে-মানুষ কাছে গেলে মিউ-মিউ শব্দ করেন
মুচকি হেসে বসতে বলেন
রুমাল ঝাড়েন নস্যি টানেন
মিষ্টিস্বরে গল্প করেন
জল হয়ে যান একেবারে পুণ্যতোয়া গঙ্গাধারা (রুদ্রসাহেব)

ঙ. বিষয়-রস দিঘির জল পুণ্যশ্লোক সাঁতার কাটে
এক সাঁতারে লুইত নদী দুই সাঁতারে গঙ্গাপার
তিন সাঁতারে বৈতরণী চার সাঁতারে স্বর্গদ্বার
পাঁচ সাঁতারে পুনর্জন্ম ছয় সাঁতারে রাজপাট। (বিষয়-রস)

চ. বাড়িঘর অমরাবতী
মেনকা নৃত্য করে দেবকুল নৃত্য দেখে
জ্যোৎস্না জ্বলে রাতদিন
টুনির মতো তারারা ফোটে বাড়িঘরে
বাড়িঘর স্বর্গপুরী
মাথায় রাখুন সঙ্গে যাবে। (মাথায় রাখুন সঙ্গে যাবে)

আমার কবিতায় বার বার মৃত্যুর উপস্থিতি। বহুরূপে তার আনাগোনা আমার রচনায়। কখনো সে চিরসুন্দর, কখনো সে শান্তিধাম, কখনো যেন মূর্তিমান বিষাদ, কখনো সে বিষাদমধুর, কখনো সে সর্বগ্রাসী, কখনো সে পার্শ্ববর্তী লোক, যে কোনো মুহূর্তে বাড়িয়ে দেবে তার হাত। কখনো মনে হয় জীবনের রপ ধরেই মৃত্যুর চলাচল। অধরা-অছোঁয়া চির অগোচর তার রূপ দেখে হই বিস্ময়-বিহ্বল। সর্বদা অনুভূত হয় তার অনিবার্যতা। মনে হয় "চারপাশে বালিয়াড়ি মরনের দেশে খুরি; শ্মশানেই শান্তির আবাস;...ঝরাপাতা হয়ে যাওয়া আমার নিয়তি...লাস্ট স্টেশনে বসে আছি সামনে অন্ধকার।" মনে হয় "জন্মমৃত্যু তুল্যমূল্য মহাবৃক্ষ থেকে ঝরা ফল।" আসন্ন মৃত্যুর উপস্থিতি দেখে মনে হয় সর্বজন আপন। অনুভব করি "শূন্য থেকে নেমে এলাম শূন্যে যাব চলে...মহাদূরে স্থায়ী বাড়ি—আসল আবাস।" অনুভূত হয় "হে অন্তিম প্রাণ নাশো দীর্ঘায়ু জনার,...মরে গেলে ফুল হয়ে ফুটব আমি, পাখি হয়ে ডাকব আমি, শিশির হয়ে ঝরব টুপটাপ"। আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে কেউ রক্ষা পেলে অনুভব করি অশেষ আনন্দ। সর্বদা অনুভব করি "দিগন্তের দিকে হাঁটি/ঠিকানা বিহীন।" ঝরে পড়া জাতকের অমোঘ নিয়তি। সেজন্য বিশ্ববিধান মৃত্যুকে নির্বিকার মনে মনে নেওয়া সঙ্গত, জীবনের বৃহত্তম পটভূমিতেই মৃত্যুর উপস্থিতি। আমার কবিতায় মৃত্যু চেতনা এতো সোচ্চার; এ বিষয়েও সমালোচকগণ প্রায় নীরব। নিচে উদ্ধৃত হল মৃত্যু চেতনা ধ্বনিত আমার কবিতার কিছু পঙ্‌ক্তি :

ক. অন্ধকারা কাছে এলে
জানলা ও দুয়ার দিয়ো খুলে
শেষবার মেখে নেবে নবীন রোদের মায়া জ্যোৎস্নার ফুল
সন্ধ্যার বাতাস নেবো
চোখ ভরে দেখে নেবো শোভন আকাশ। (অন্ধকার কাছে এলে)

খ. মৃত্যুর বাসভূমি
জীবন থেকে খুব দূরে নয়
কখনো কয়েক মাইল
কখনো কয়েক হাত
কখনো দিগন্ত রেখায়
তার বাস
কখনো দেহলিতে
যে অপেক্ষমান (মৃত্যুর বাসভূমি)

গ. আমার বাবার মুখ গুণবতী মায়ের মুখশ্রী;
ঠাকুরদার রাজির্ষর মতো ছবি ঝরে গেছে জলে;
আমার সোদর বোন কত বন্ধু কত পরিজন
জীবনের ভূমি থেকে উড়ে গেছে পাখির মতন;
কালস্রোতে ভেসে গেছে রূপবতী ঠাকুমার মুখ;
ঊনকোটি সঙ্গী সাথী ভেসে গেছে কান্দিনীর জলে;
কেঁদেও পাবো না কাকে, ভেসে গেছে কালের প্রবাহে;
কালের অতলে তারা ভ্রাম্যমান ছায়ামূর্তি সব। (চরাচরে কোথা আছে চর)

ঘ. মহাবৃক্ষে মূলে আছি যেন এক ফল
যে কোনো মুহূর্তে হবে আমার পতন
তৃণতুল্য জীব এক,
ঝঞ্ঝাঘাতে ঝরে পড়ে আমার নিয়তি। (নিয়তি)

সত্তরের দশকের প্রথম দিকে আমি দুটি শেক্সপীয়রীয় রীতির সনেট লিখেছিলাম এবং তার একটি অধুনালুপ্ত আমার সম্পাদিত কবিতার কাজ 'শিলঙের কবিতা'য় বেরিয়েছিল। তারপর দীর্ঘদিন আমি সনেট লিখিনি। কিন্তু বাংলাদেশের বিখ্যাত কবি জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর অনূদিত 'শেক্সপীয়রের সনেট' গ্রন্থটি পড়ে আমি যার-পর-নাই অভিভূত হয়ে পড়ি। ফলে গ্রন্থটি আমি বার বার পড়ি। অতঃপর সনেট পড়া আমার নেশা হয়ে দাঁড়ায়। ইংরেজি ভাষায় লেখা সনেটের দু'টি বিখ্যাত সংকলন বারংবার আমি পড়ি। সেসব সনেট অনেকবার পড়ে সনেটের রচনারীতির প্রতি আমি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। ধ্রুপদী রীতিতে রচিত সনেটগুলির রসমাধুর্য আমাকে পুরাতন নয়—এক অভিনব জগতের চাবিকাঠি

খুলে দিল। বারবার ভাবতে থাকি আমিও সনেট লিখব। কিন্তু আমার কলমে সনেট আসে না। একদিন এই কঠিন কর্মটি আমার করায়ত্ত হল। আমি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটি সনেট লিখে ফেললাম। সে সময়ে হৃদয় জনিত একটি ঘটনাও ঘটেছিল আমার জীবনে। সে ঘটনার অভিঘাতে অগাস্ট ১৯৯৭ থেকে একনাগাড়ে প্রায় দেড় বছর কাল স্বপ্নাবিষ্টের মতো লিখতে থাকি সনেট—একটির পরে অন্য একটি সনেট সাদা কাগজে ঝরতে থাকে আমার ডটপেন থেকে। তখন থেকে দীর্ঘদিন মুখ্যত সনেট লিখেই করেছি আত্মপ্রকাশ। এই ধ্রুপদী রীতিকে বরণ করার প্রেক্ষিতে আমার সাহিত্যিক অভিপ্রায়ও নিহিত ছিল। সাম্প্রতিক কালের বাংলা কবিতার ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা দেখে আমি তটস্থ ছিলাম। ভাবলাম সনেটের আঙ্গিকে কবিতা রচনা করাই শ্রেয়। সেক্ষেত্রে আমার স্বকীয়তা প্রতিপন্ন হবে নির্দ্বিধায়। হলও তাই। শুরু করলাম চতুর্দশপদী লেখা। পরবর্তী পর্যায়ে পেত্রার্কীয় ও শেক্সপীয়রীয় রীতির মিশ্রণে লিখতে লাগলাম সনেট—লিখতে লাগলাম শেক্সপীয়রীয় রীতিতেও সনেট। এখানে একটা কথা বলে রাখি, এ দুটি রীতির শৈল্পিক সুষমা অনুপম। দু'টি রীতির সনেটই রসমাধুর্যে স্বর্ণপদ্ম বা নীলকমলের মতোই চিরসুন্দর। সনেটের রচনারীতিতেই প্রস্ফুট শৈল্পিক সুষমা। সে কারণে সনেটের রচনা রীতিতেই বহু বন্ধন থাকা সত্ত্বেও মুক্তির দূতী। এখানে সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদীর অবগতির জন্য উদ্ধৃত করলাম আমার একটি সনেট :

ফুল ঝরে ফল ঝরে পাতা ঝরে ঝরে বটগাছ;
নির্বেদ অনন্ত ভালো সুখ দুঃখ নিত্য ডালভাত;
কালো ভালো আলো ভালো একাকার দেবদ্বিজনাথ;
আঁধার আলোক ভালো তুল্যমূল্য ছোটবড় মাছ।
ক্ষণে ক্ষণ মহাবৃক্ষ থেকে ঝরে ঊনকোটি ফল;
ফলে বন্ধু পরিজন অশ্রুজলে রোজ করে স্নান;
প্রতিবেশীগণ কেঁদে বেদনার জলে ভাসমান।
ফুল ঝরে ফল ঝরে কোটি চোখ থেকে ঝরে জল।

নির্বেদ অনন্ত ভালো সুখ দুঃখ নিত্য ডালভাত;
তুল্যমূল্য বনজ্যোৎস্না ফুল ফণী-মনসার বন;
একাকার ধানীজমি দাউ-দাউ জঙ্গল কানন।
নির্বেদ অনন্ত ভালো তুল্যমূল্য পাহাড় প্রপাত;
একাকার গোবিথর গ্রামগঞ্জ শ্যাম বনস্থল;
জন্মমৃত্যু তুল্যমূল্য মহাবৃক্ষ থেকে ঝরা ফল।

সবশেষে বলি বাংলা ভাষায় প্রচলিত চারটি ছন্দ কথা স্বভাবোক্তি আমার কবিতার বাহন। মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত কবিতার সংখ্যাই আমার বেশি। দলবৃত্ত ছন্দে লিখেছি অনেক

কবিতা; স্বরবৃত্ত ছন্দেও লিখেছি কিছু সংখ্যক কবিতা; গদ্যবৃত্তে লেখা আমার কবিতার সংখ্যাও নেহাত কম নয়। শুধু স্বভাবোক্তি বা অতিশয়েক্তি নয়—কল্পনার দাক্ষিণ্যে উপমা উৎপ্রেক্ষা প্রতীক চিত্রকল্প আর রূপকল্প ঘুরে ফিরে এসেছে আমার কবিতায়। সর্বদা সচেষ্ট থেকেছি যাতে আমার কবিতায় অলঙ্কারাদির প্রয়োগ স্বাভাবিকতা থেকে বিযুক্ত না হয়। দূরান্বয়ী কাব্যভাষাও আমার কবিতায় সতত পরিহার করেছি; যাতে আমার কবিতার ভাব ও ভাষা প্রক্ষিপ্ত না হয় সে দিকেও রেখেছি সতত দৃষ্টি। আমার কবিতায় সহজ সরল আড়ম্বরহীন ভাষার ব্যবহার এই সব বিঘটন রোধে রক্ষা কবচের মতো কাজ করেছে। আসলে সহজ সরল ভাষায় রচিত কবিতাই আদর্শ কবিতা। যথার্থ কবি প্রতিভার অধিকারী মাত্রেই অনাড়ম্বর ভাষায় কবিতা রচনা করে জীবনের গভীরতম উপলব্ধি প্রকাশে তৎপর হন এবং তা অনায়াসে রসিক জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সর্বোপরি একজন কবির চাই স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি—নিজস্ব রচনারীতি। এ দু'টি গুণের সমন্বয়েই রচিত হয় মৌলিক কবিতা—রচনায় প্রকাশ পায় কবির বৈশিষ্ট্য।

২০১২

প্রবন্ধকার শুভেন্দু বারিক

বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত সাহিত্যগত 'কবিপত্র'-এর সহযোগী সম্পাদক অধ্যাপক শুভেন্দু বারিক একজন উত্তম প্রাবন্ধিক। তিনি লেখেন কম। কিন্তু ক্ষুরধার তাঁর লেখনী। তাঁর প্রবন্ধগুলি বিশিষ্ট হয়ে ওঠে তার রচনারীতির গুণে— লিখিত বিষয়বস্তুর তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণে তিনি পারঙ্গম। আসলে প্রবন্ধ রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। আমার হাতের কাছে আছে একটি গ্রন্থ, তিনটি বৃহদাকার ম্যাগজিন ও একটি দৈনিক পত্রিকার রবিবাসরে লেখা তাঁর পাঁচটি প্রবন্ধ। সেগুলির সামান্য বিশ্লেষণ করে তাঁর রচনার উপর আমার বক্তব্য রাখছি।

দুর্গাদাস মিদ্যা সম্পাদিত সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা ' আরাত্রিক'- এর ষোড়শ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যাটির বিষয় 'রূপে, অরূপে, বহুরূপে বিবেকানন্দ'। বৃহদাকার এই ম্যাগাজিনটিতে বেরিয়েছে শুভেন্দু বারিকের 'চিকাগো বক্তৃতার অভিমুখ' নামে প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধটিতে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শন, তাঁর দেশপ্রেম, ধর্মসংক্রান্ত তাঁর অভিমত ইত্যাদি নিয়ে তিনি করেছেন আলোচনা। প্রবন্ধটিতে স্বামীজির বক্তৃতা অবলম্বনে পরধর্মে শ্রদ্ধাশীল হিন্দু জাতির মহান আদর্শের কথা বলা হয়েছে, বলা হয়েছে পরধর্মে অসহিষ্ণুতার বিষফলের কথাও। নাতিদীর্ঘ এই প্রবন্ধটি স্বামী বিবেকানন্দকে জানার পক্ষে একটি উত্তম রচনা। প্রবন্ধটিতে সংক্ষেপে বিধৃত হয়েছে ভারত ধর্মের প্রবক্তা স্বামীজির আদর্শ।

শুভেন্দু বারিক লিখিত 'পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের মহাকবিতা' ও গদ্যশিল্পী পবিত্র মুখোপাধ্যায়' প্রবন্ধ দু'টি যথাক্রমে বেরিয়েছে 'কবির কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়' গ্রন্থ এবং বৃহদায়তন সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা 'বনানী ২০১২'-এর এপ্রিল সেপ্টেম্বর সংখ্যায়। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন দেবাংশু ঘোষ ও শুভেন্দু বারিক, পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছেন অধীরকৃষ্ণ মণ্ডল। পত্রিকাটির সংখ্যাটি গত শতকের ষাটের দশকের ছয়জন কবির উপর বহু গুণিজনের তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা। শুভেন্দু বারিকের কবীশ পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের উপর আলোচনাটিও খুব তাৎপর্যপূর্ণ। সংক্ষেপে পবিত্র মুখোপাধ্যায় রচিত আটটি মহাকবিতা সংগ্রহ যথাক্রমে 'শবযাত্রা' 'মোহন তরণী', 'ইবলিশের আত্মদর্শন', 'বিযুক্তির স্বেদরক্ত', 'অলর্কের উপাখ্যান', 'ভারবাহীদের গান', 'পরশুরাম পর্ব' ও 'জতুগৃহে আছি'র মূল পুরাণকথা (যেসব গ্রন্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য), বক্তব্য, বৈশিষ্ট্য তথা সেগুলির চিরকালীনতাকে অগ্রাধিকার দিয়েই লেখা হয়েছে প্রবন্ধটি। কাব্যগুলি থেকে উদ্ধৃতি সহ লেখা এই প্রবন্ধটি পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের মহাকবিতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের গদ্যের উপর লেখা তাঁর প্রবন্ধটিও চমৎকার। নানা দৃষ্টিকোণ

থেকে তাঁর গদ্য লেখাগুলি আলোচনা করে তিনি এই সত্যে উপনীত হয়েছেন যে পবিত্র মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের শুধু বিশিষ্ট কবিই নন— তিনি বাংলা ভাষার অসাধারণ গদ্যশিল্পীও। তাঁর গদ্য তাঁর কবিতার মতোই স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল। কিছু কিছু রচনাংশ উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন সেগুলি কবিতার স্বগোত্র।

সাহিত্য পত্রিকা কবিপত্র-এর ৫৫ বছর, বৈশাখ সংখ্যায় শুভেন্দু বারিকের একটা আলোচনা বেরিয়েছে, সেটির শিরোনাম 'কবিতাভুবনে তিন পদাতিক'। এ লেখাটিতে তিনজন নয়, চারজন কবির চারটি গ্রন্থের উপর সংক্ষিপ্ত একটি প্রবন্ধ লিখেছেন শুভেন্দু বারিক। এ প্রবন্ধে আলোচিত, কাব্যগ্রন্থগুলি হল কবি প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষের 'বৃহন্নলা জাগো', কবি তাপস রায়ের 'মহেঞ্জদাড়োর ধ্বংসাবশেষ', কবি অদীপ ঘোষের নির্বাচিত কবিতা ও কবি সোমনাথ রায়ের 'সনেট ৫০'। গ্রন্থগুলি সংক্ষিপ্তভাবে-আলোচিত হলেও প্রতিজন কবির কবিতার মূল সুর ধরা পড়েছে তাঁর লেখায়। কবিদের কবিতার অনেক পঙ্‌ক্তির উদ্ধৃতিসহ আলোচনাটি সমাপ্ত হওয়ায় রচনাটি যে তাঁদের কবিতার উত্তমমূল্যায়ন সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত। কবিদের কবিতার কিছু উজ্জ্বল পঙ্‌ক্তি :

১. মৃত্যুর শেষ ফিতে সামান্যই দূর
ছোট একটা সাঁকো শুধু পার হওয়া (প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ)

২. বিয়েমাস শেষ হচ্ছে পার্কে বেঞ্চিতে (তাপস রায়)

৩. বেড়াল এবাড়ির ওবাড়ির রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে ধর্ম খায়। (তাপস রায়)

৪. ভবের সমস্ত হাটে মহাজনই মহা অক্সিজেন
তিনি হাঁড়ির চালের ভগবান
তিনি ঘরের চালের ভগবান
এই মুক্তাঞ্চলে তাঁর হাত-পা ছড়ানো দশদিকে (অদীপ ঘোষ)

৫. মহাজন ঋণ দেবে আঙুলে হিরের আংটি দেখে।
সহৃদয় হৃদয় সংবাদী এসব পঙ্‌ক্তি অতি মধুস্বাদী। (সোমনাথ রায়)

গুয়াহাটি থেকে উদয়ন বিশ্বাস সম্পাদিত ১৩ মে ২০১২-এর 'সংবাদ লহরি রবিবাসর'-এ প্রবন্ধকার শুভেন্দু বারিকের 'দায়বদ্ধ কবি রমানাথ ভট্টাচার্য' এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এই রচনাটি যেহেতু বর্তমান নিবন্ধকারের উপর লিখিত সে কারণে আমি গঙ্গাজলেই গঙ্গা পূজা করছি। এ প্রবন্ধটিতে নিবন্ধকারের কবিতার আলোচনা করে তাঁর রচনার স্বকীয়তার পক্ষে শুভেন্দু বারিকের যুক্তিটি তুলে ধরছি : ''আমাদের সর্বশেষ প্রসঙ্গ কবি রমানাথ ভট্টাচার্যের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে; কাব্যভাষাই এক কবিকে 'অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র বলে চিহ্নিত করে। যেকবি সারা জীবন অজস্র লিখলেন অথচ তাঁর কোনো কাব্যভাষা তৈরি হল না— তাঁকে নিখিল কবিসভায় আহ্বান করা দুরূহ। কিন্তু রমানাথের রচনায় এমন সব অভ্রান্ত অমোঘ পঙ্‌ক্তি পেয়ে যাই যে স্বাক্ষরহীন অবস্থায়ও সেগুলিকে নিশ্চিতভাবে চিনে নিতে পারি। দু'চারটি উদাহরণ...

এখন একটুখানি বলি শুভেন্দু বারিকের প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য কী।

১. প্রবন্ধে তিনি পল্লবিত করেন না তাঁর বক্তব্য; প্রসঙ্গান্তরে না-গিয়ে সারকথা বলেন।

২. সত্যের আলোকে বিচার করেন আলোচিত বিষয়; সেকারণে যুক্তিপূর্ণ তাঁর বক্তব্য।

৩. পাণ্ডিতি ভাষায় নয়, ঝরঝরে ভাষায় তিনি লেখেন তাঁর প্রবন্ধ।

সবশেষে ব্যক্তি শুভেন্দু বারিক কেমন তা অতি সংক্ষেপে বলি। 'কবিপত্র'-এর সহযোগী সম্পাদক তথা পত্রিকাটির দীর্ঘদিনের শুভানুধ্যায়ী শুভেন্দু বারিক চমৎকার মানুষ। বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি তাঁর সীমাহীন ভালোবাসা আমাকে বিস্ময়াবিষ্ট করে রেখেছে। কথাটা খুলে বলি: আমার কবিকৃতির উপর গবেষণা করছেন স্নেহাস্পদ কবি প্রাবন্ধিক পার্থ শর্মা। গবেষণা সংক্রান্ত কাজে গত জুন মাসে কলকাতা থেকে কয়েদিনের জন্য পার্থ এলেন শুভেন্দুবাবু সহ বিমানযোগে আমার বর্তমান বাসস্থান মুম্বাইয়ে। আশ্চর্য, স্রেফ কাব্যানুরাগ বশত তিনি পার্থকে সঙ্গ দান করলেন। আজকের দিনে এরকম মহানুভব মানুষ মেলে? শুভেন্দুবাবু ব্যতিক্রম। তাঁর মতো মহৎ ব্যক্তির সঙ্গ পেয়ে আমি ধন্য, অতি-অতি মুগ্ধ। জীবনভর মনে রাখার মতো মানুষ তিনি।

আগামী ১৯ আক্টোবর কলকাতায় শুভেন্দুবাবুর ৭১তম জন্মদিন পালিত হচ্ছে। এই উপলক্ষে তাঁর শতায়ু কামনা করে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ব্যতিক্রম গোষ্ঠীর সম্মাননা অনুষ্ঠানে ভাষণ

বহু যুগ ধরে কবিতা লেখা হচ্ছে। যুগ-যুগ ধরে কবিরা দেখছেন হাজার রকম অসত্যে অসততায় কণ্টকাকীর্ণ জীবরে পথ, দেখছেন সোনালি রুপালি গোলাপি অন্ধকারে ধোঁয়াশাচ্ছন্ন জগৎ জীবন— দেখছেন অমৃত সন্ধানী লোকের সঙ্গে যত্রতত্র অসুরের সংঘাত। তাই সর্বকালের কবিকূলের প্রতিনিধি হয়ে উপনিষদের কবির উচ্চারণ :

অসতো মা সদগময়ঃ
তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ
মৃত্যুর্মামৃতং গময়ঃ

আমি বাংলা ভাষার সাধারণ এক কবি। জীবনভর দেখেছি বড় অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীর পথ— সব ধরনের বিনষ্টির আড়ত পার্থিব জগৎ— কখনো-কখনো মনে হয়েছে বাসযোগ্য নয় এ পৃথিবী।

আমার মতো করে আমার সামান্য প্রতিভার সামর্থ্য অনুসারে নিরলস চেষ্ট করেছি সুন্দরের মুখচ্ছবি অঙ্কনের— মহামরুভূমি স্বরূপ জীবন পথে অমৃতরস সিঞ্চনের। এ ব্যাপারে আমার সাফল্য, ব্যর্থতা গুণিজন করবেন বিচার। তবে সর্বগ্রাসী বিনষ্টির দণ্ডোৎপাটন কোনো কালেই সম্ভব হয়নি— সে কারণে লঙ্কাকাণ্ড, কুরুক্ষেত্র, ট্রয়যুদ্ধ মানুষের অমোঘ নিয়তি। আমরা শুধু জ্যোতির্ময়ের স্বপ্ন দেখতেই পারি— বাস্তবে অকল্পনীয় তাঁর আর্বিভাব, তিনি রামায়ণের স্বর্ণমৃগের মতোই চির পলাতক। তাইতো 'স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় বলে উঠি:

অস্ত সূর্য দেখি রোজ। সূর্যোদয় দেখিনি জীবনে।
প্রতিদিন অন্ধকারে বাস।
অন্ধকারে পড়ে রোজ নিশ্বাস-প্রশ্বাস।
উদয়-ভানুর গল্প বলে গেল বহু মহাজনে।
কবীশ বাল্মিকী থেকে পরবর্তী হাজার কবীন্দ্র
কত সূর্য-উদয়ের দেখেছেন স্বপ্ন।
সূর্য ওঠা স্বপ্ন কত দেখেছেন বাংলারও রবীন্দ্র।
যুগে যুগে স্বপ্নভঙ্গ, ফলেনি কখনো।

ব্যতিক্রম গোষ্ঠী আমার ক্ষুদ্র কাব্য প্রচেষ্টাকে সম্মাননা জানালেন— এ শুধু আমাকে নয় সব কবিতা প্রেমীকেই সম্মাননা। অশেষ ধন্যবাদ।

২৩.৬.২০১২

জীবনানন্দ সভাঘরে সংবর্ধনাকালে ভাষণ

জন্মসূত্রে পেয়েছি কবিতা রচনার শক্তি। পারিবারিক সূত্রে আসামের বিখ্যাত পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ, ভূপর্যটক রমানাথ বিশ্বাস, বিশিষ্ট ভক্তিগীতি রচয়িতা তথা সঙ্গীতকার স্বামী চণ্ডিকানন্দ মহারাজের কাছ থেকে পেয়েছি সাহিত্য সংস্কৃতি শিল্প সঙ্গীতের প্রতি গভীর ভালবাসা। এবং তাঁদের মহৎ জীবনকে অনুসরণ করার ব্রত। একজন কবিশিল্পীর পক্ষে এই প্রাপ্তি যথেষ্ট নয়। সে কারণে আমার সাধ্যানুসারে অধ্যয়ন করেছি বাংলা ও অসমীয়া কবিতা, বাংলা, অসমীয়া এবং ইংরেজি অনুবাদে অনেক বিদেশি কবিতা; বাংলা সাহিত্যেও নিয়েছি এম.এ. ডিগ্রি। উদ্দেশ্য আমার কবিতা লেখার শক্তিকে উজ্জীবিত করা— অগ্রজ কবিদের মতো তাৎপর্যময় করে তোলা। এহ বাহ্য। শিল্প সাহিত্যের জগতে একা একা পথ চলা সম্ভব নয়। চাই দোসর। অসমীয়া সাহিত্যের প্রধান কবি নীলমণি ফুকনের সঙ্গে হল পরিচয়—অসমীয়া কবিতার অনুবাদ সূত্রে আমি হয়ে উঠলাম তাঁর স্নেহভাজন। বিশ্ব কবিতার পাঠক নীলমণি ফুকন আমাকে দেখালেন বিশাল কবিতার রাজ্যে চলার পথ। "আলো হাতে ভার্জিলের মতো পথ দেখালেন কবি নীলমণি"। এরকম পঙ্‌ক্তি লিখেই আমার কবিতা লেখার ক্ষেত্রে তাঁর উৎসাহকে করেছি অভিনন্দিত। তাঁর ও অসমীয়া ভাষার অন্য প্রধান কবি প্রয়াত নবকান্ত বরুয়ার উৎসাহেই বেরিয়েছে আমার নির্বাচিত কবিতা।

আমাদের ভাষার বিশিষ্ট কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের কাছে আমি বহু ঋণে ঋণী। স্বতোপ্রনোদিত হয়ে তিনি আমার নির্বাচিত কবিতার একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা লেখে দেন। তাঁর ভূমিকা সংবলিত এই গ্রন্থটি প্যাপিরাস থেকে বেরোল কলকাতা সহ বহির্বঙ্গের বহু গুণীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংকলনটি। গ্রন্থটি আলোচিত হতে থাকে বিশেষ করে কলকাতার বহু পত্রপত্রিকায়। 'নির্বাচিত কবিতা'র সদর্থক আলোচনা আমাকে উৎসাহিত করে— ফলে কলম থেকে কাগজে ঝরছে অজস্র কবিতা। 'নির্বাচিত কবিতা'র বিদগ্ধ আলোচকদের এই সুযোগে জানাই আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।

কবি প্রাবন্ধিক গবেষক পার্থ শর্মার সম্পাদনায় আমার সাহিত্যকৃতির উপর প্রকাশিত 'মগ্নশিল্প'-এর বিশেষ সংখ্যাটি এবং তাঁর লেখা 'কবি রমানাথ : জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থটি উন্মোচিত হচ্ছে দেখে আমি অভিভূত। সুপ্রচুর পরিশ্রম সাপেক্ষ এই দু'টি সাহিত্য কর্মের জন্য পার্থ শর্মা ও তাঁর সহযোগীদের জানাই অসংখ্য সাধুবাদ। এই সুযোগে এ দু'টি সাহিত্যকর্মের পরিকল্পক কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়কেও আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

উপস্থিত সুধীবৃন্দকে আমার অভিনন্দন জানাই।

৪.১২.২০১২

কবীশ পবিত্র মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ কবিকূল শিরোমণি। এই চূড়ামণি কবি ছাড়াও আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আছেন অনেক স্বর্ণপ্রসূ কবি। তাঁরা হচ্ছেন মধুসূদন দত্ত, বিহারীলাল চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাস, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শঙ্খ ঘোষ। তাঁদেরই সমপর্যায়ের স্বর্ণপ্রসূ কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়।

কেন তাঁকে আমি বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির শিরোপায় ভূষিত করছি তার মুখ্য কারণ হচ্ছে সুষমামণ্ডিত তাঁর কাব্যভাষা, সংখ্যাহীন স্মরণীয় পঙ্‌ক্তিতে স্বর্ণোজ্জ্বল তাঁর প্রতিটি কাব্যগ্রন্থ। তাঁর 'শবযাত্রা' 'ভাসান' ও 'ইবলিসের আত্মদর্শন', এই তিনটি গ্রন্থের প্রায় সর্বত্র স্মরণীয় পঙ্‌ক্তির ঝলমলে উপস্থিতি। মহাকবিতার আধারে রচিত তাঁর এসব গ্রন্থ। 'অলর্কের উপাখ্যান', 'ভারবাহীদের গান', 'বিযুক্তির স্বেদরক্ত', 'পরশুরাম পর্ব' ও 'জতুগৃহে আছি' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থও মহাকবিতার সমাহারে রচিত। এসব গ্রন্থও নিঃসন্দেহে মহৎ রচনা। বলি, এক জায়গায় আমি কবুল করেছি "... একটি ভালো কবিতা মাত্রেই মিতবাক্, ব্যঞ্জনাধর্মী, প্রতীকী বা বহুমাত্রিক; এককথায় বাচ্যার্থ অতিক্রম করে ব্যাঙ্গার্থের অধিকারী; সতত রসাত্মক এবং ত্রিকাল চেতনায় অনুরণিত। এসব গুণাবলীর সমাহারেই সৃষ্ট হয় মহৎ কবিতা; গভীরতা যার সাগরের মতো অতল— বিস্তার যার মহাদেশের মতো। সাধারণত মহাকবিতা বা দীর্ঘ কবিতার পরিসরেই রচিত হয় মহৎ কবিতা।" মহাকবিতার আধারে রচিত পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের এসব কাব্যগ্রন্থও অনুরূপ রচনা। রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত তাঁর 'আমি ভূতগ্রস্ত কবি' কাব্যগ্রন্থটিও একটি অসাধারণ সৃষ্টি। সামগ্রিক জীবনবোধের অন্বয়ে কাব্যগ্রন্থটি অনন্য।

আমি পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের এক গুণমুগ্ধ কবিপাঠক। তাঁর অনেকানেক অত্যুজ্জ্বল সনেট ও তাঁর মহাকবিতাগুলি পড়ে আপ্লুত আমি তাঁকে নিয়ে 'কবীশ পবিত্র' নামে একটি চতুর্দশপদী লিখেছি। এই কবিতাটিতে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কবিতা সম্পর্কে আমার সুউচ্চ ধ্যান ধারণা। সেকারণে কবিতাটির একাংশ এখানে উৎকলিত করছি:

শবযাত্রা বৃষ্টি ভেজা পুষ্পের মিছিল;
ঈশ্বরীয় অন্যায়ের জলজ্যান্ত প্রতিবাদ তোমার ইবলিস;
বিযুক্তির স্বেদরক্ত শিল্পীত সাম্যের মহাগান;
নারীর স্বপক্ষে তোমার পরশুরাম ধরে ধনুর্বান;
তোমার অলর্ক বলে: টাকা মাটি, রাজ্যরাজা সব ধুলোবালি।

জেনে 'গেছি তোমার অনেক সৃষ্টি'— 'অজর- অমর'।

নমস্কার, নমস্কার তোমাকে কবীশ।

আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে অনেক অনেক ঋণী। তিনি স্বতোপ্রণোদিত হয়ে লিখে দিয়েছেন আমার 'নির্বাচিত কবিতা' গ্রন্থের ভূমিকা এবং আমার কবিতা যাতে সহৃদয় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার জন্যও তিনি আন্তরিকভাবে সত্রত সচেষ্ট, তিনিই কবি প্রাবন্ধিক পার্থ শর্মাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন আমার সাহিত্যকর্ম নিয়ে লিখতে। তারই অনির্ব অভিজ্ঞান 'কবি রমানাথ : জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থটি ও 'মগ্নশিল্প'-এর কবি রমানাথ ভট্টাচার্য সংখ্যাটি। পবিত্র মুখোপাধ্যায় কীভাবে আমাকে কবিতা লিখতে উৎসাহিত করেন এ ব্যাপারে একটুখানি বলছি: কিছুদিন আগে এক সকালবেলা দূরভাষে তিনি আমাকে বললেন— "আপনি ভালো মানুষ সে জন্যই আপনি লিখতে পারেন ভালো কবিতা। আমি বিশ্বাস করি ভালো মানুষই লিখতে পারেন ভালো কবিতা"। তাঁর কথা শুনে আমি আনন্দে হতবাক। নমস্কার কবীশ। ১৯.০৭.২০১৪

স্বামী চণ্ডিকানন্দ মহারাজ

এক

রামকৃষ্ণ ভুবনের বিখ্যাত ভক্তিসঙ্গীত রচয়িতা ও সুগায়ক তথা সুরকার স্বামী চণ্ডিকান্দ মহারাজ প্রাক-সন্ন্যাস জীবনে আমার জ্ঞাতি জ্যাঠা মহাশয় ছিলেন। তিনি, ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস ও আমার পিতৃদেব স্বর্গত রমণী মোহন ভট্টাচার্য ছিলেন পরস্পর সপিণ্ড জ্ঞাতি। আর বিখ্যাত পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের পিতামহ ও আমার ঠাকুরদা জানকীনাথের পিতামহ ছিলেন পরস্পর সহোদর ভ্রাতা। আমাদের বংশে বা বৃহত্তর পরিবারে বনস্পতি স্বরূপ উচ্চশির এই তিন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছিলেন—তাঁদের বিস্তৃত ছায়াতলে দাঁড়িয়েই জীবনভর চলেছি পথ। তাঁদের কাছ থেকেই পেয়েছি সাহিত্যের পথে চলার অশেষ প্রেরণা। তাঁদের প্রতি সবিশেষ শ্রদ্ধা জানাবার উদ্দেশ্যেই আমার নামে গঠিত ফাউন্ডেশনপ প্রতি বছর দিচ্ছে পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ সাহিত্যস্মৃতি পুরস্কার তথা ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস সাহিত্য স্মৃতি পুরস্কার। আর গুয়াহাটিতেই গত চার বছর ধরে এই দুটি স্মৃতি পুরস্কার অনুষ্ঠান হচ্ছে মহাপুরুষ শঙ্করদেব বা মহাপুরুষ মাধবদেব রচিত 'বরগীত' পরিবেশন করে এবং স্বামী চণ্ডিকানন্দ রচিত 'শৌর্য দাও বীর্য দাও' ভক্তিসঙ্গীতটি পরিবেশন করে।

স্বামী চণ্ডিকানন্দ মহারাজ সম্পর্কে আমার দু'চার কথা বলার আছে সেকারণেই এই ভূমিকার অবতারণা।

অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত বিখ্যাত বানিয়াচঙ গ্রামের বিদ্যাভূষণপাড়ায় পাশাপাশি অবস্থিত ছিল চণ্ডিকানন্দ মহারাজ (প্রাক-সন্ন্যাস জীবনে যাঁর নাম ছিল জিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস) তথা রামনাথ বিশ্বাস আর আমাদের বসতবাড়ি দুটি। দুটিই ছিল শরিকি বাড়ি। চণ্ডিকানন্দের বাবা ও রামানাথের কাকা ছিলেন রায়সাহেব গিরিজা বিশ্বাস। তাঁদের বাড়িটি রায়সাহেবের বাড়ি নামে পরিচিত ছিল। আর আমাদের শরিকি বাড়িটি জানকী ডাক্তারের বাড়ি—এই নামে পরিচিত ছিল। (জানকী ডাক্তার ছিলেন আমার পিতামহ)। তাঁদের ও আমাদের বাড়ির মধ্যিখানে একটি গোপাট ছিল। বর্ষাকালে সেটি জলমগ্ন হয়ে যেত। সে কারণে বৃষ্টির দিনে পাড়ার লোকজনের যাতায়াতের সুবিধার জন্য দুটি বাড়ির মধ্যিখানে একটি সাঁকো বেঁধে দেওয়া হত। সুপুরি গাছে একটি দীর্ঘ কাণ্ড দিয়ে সাঁকোটি নির্মিত হতো। ১৯৩৫-৩৬ সালে পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের নবনির্মিত বাসভবনের পূর্ব-দক্ষিণ দিক থেকে সাঁকোটি শুরু হয়ে রায়সাহেবের বাড়ির উত্তর পূর্বাংশে তা শেষ হতো। মান্ধাতার আমল থেকে এই স্থানেই সাঁকোটি নির্মিত হতো।

বিদ্যাভূষণপাড়াবাসী চণ্ডিকানন্দের পিতৃদেব গিরিজা বিশ্বাস ছিলেন প্রচুর জমি-মাটির মালিক তথা কসবা বানিয়াচঙের বিখ্যাত ব্যক্তি। এই গ্রামে তিনি 'ভিলেজকোর্ট' চালু করেন।

চণ্ডিকানন্দের মা সৌদামিনী দেবী বানিয়াচঙ-গ্রামে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁরই অক্লান্ত উদ্যমে ও তাঁর স্বামী গিরিজা বিশ্বাসের অশেষ সহযোগিতাহয় তাঁদের শরিকি বাড়িতে গড়ে উঠেছিল প্রাইমারি বালিকা বিদ্যালয়। সেই বিদ্যালয়ে আমাদের পাড়ার মেয়েরা তো পড়তেনই, অন্যান্য পাড়ার মেয়েরাও এসে পড়াশোনা করতেন। অন্যান্য পাড়া থেকে মেয়েদের বিদ্যালয়ে নিয়ে আসার জন্য এবং তাদের বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য দু'তিন জন বেতনভোগী ঝি-ও নিযুক্ত করা হয়েছিল। (এ আমার স্বচক্ষে দেখা।) সেই বিদ্যালয়টি প্রধানত সৌদামিনী দেবী একাই চালাতেন তবে খুকুদেবী নামে অন্য একজন মহিলাও সে স্কুলটির সহকারী শিক্ষিকা ছিলেন।

সৌদামিনী দেবী ছিলেন গোলগাল চেহারার অধিকারী শ্যামবর্ণা মহিলা। অসাধারণ ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব। পাড়ার নাতি-নাতনিরা দস্তুরমতো তাঁকে ভয় করতো—দেখত অতি সমীহের চোখে। কিন্তু তার মনটা ছিল আলতা-রাঙা।

একদিনের কথা মনে পড়ছে। দিদি মহামায়ার কোলে বসে তাঁদের বাড়িতে বেড়াতে গেছি, আমাকে দেখে তিনি অতি খুশি হয়েছিলেন, তাঁর মুখে ফুটে উঠেছিল খুশির সাদাজবা।

রায়সাহেবের শরিকি বাড়িতে পুরুষাণুক্রমে হতো দুর্গাপূজা—ছিল বিশাল নাটমন্দির। নাটমন্দিরটির উত্তরাংশ ছিল দু'তিন ফুট উঁচু, সত্তর আশি ফুট দীর্ঘ ও বারো চোদ্দ ফুট প্রস্থ। বছরে-বছরে সেই স্থানটির মধ্যিখানে বসানো হতো সপরিবারে দুর্গাপ্রতিমা, পূজার দিনগুলিতে লোকজন—আত্মীয় স্বজন বসার জন্য নাটমন্দিরটিতে পেতে দেওয়া হতো প্রচুর বেঞ্চি। বিদ্যাভূষণপাড়া ছাড়াও অন্যান্য পাড়াতে ছড়ানো আমাদের জ্ঞাতিবর্গ ও গ্রামের অগণন লোক মহামোদে উপভোগ করতেন সে বাড়ির পূজা। পূজার তিন চারদিন আমাদের সমূহ জ্ঞাতি মধ্যাহ্ন ভোজন করতেন রায়সাহেবের বাড়িতেই।

জীবনে চণ্ডিকানন্দকে দেখেছি তিনবার। একবার বাল্যবয়সে, একবার কৈশোরে, অন্যবার ভরযৌবনে। বাল্যে এক সকালবেলা তাঁকে দেখেছি তঁদের বাড়ির নাটমন্দিরের পাশে—বাড়ির পূর্বাংশে। তখন তিনি দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখছিলেন গাছ-গাছালিতে ভরা তাঁদের বহির্বাড়ির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। সে মুহূর্তে তাঁর এক ভ্রাতুষ্পুত্রী এসে বললেন "আসুন মহারাজ, চা হয়ে গেছে।" তখন তিনি গেরুয়া বস্ত্র পরিহিত শ্মশ্রুগুম্ফহীন এক সুপুরুষ সন্ন্যাসী, তপ্ত কাঞ্চনের মতো ছিল তাঁর গায়ের রং।

দ্বিতীয়বার তাঁকে দেখেছি নিলামবাজারস্থিত বিপিনচন্দ্র হাইস্কুলে। তখন আমি সেই স্কুলের ছাত্র। (স্থানটি সদর শহর করিমগঞ্জ থেকে দশ-বারো মাইল ভেতর)। সে সময়ে তাঁর বয়স ছিল ৫০-৫৫, চোখে-মুখে ছিল দিব্যজ্যোতি, কাঁচা-পাকা দাঁড়িতে আবৃত ছিল মুখ। তিনি এলে স্কুলে সভা বসে। "সেই সভায় তাঁর শৌর্য দাও বীর্য দাও নবীন জীবন

দাও" গানটি তাঁরই ললিত-মধুর জলদগম্ভীর কণ্ঠে গীত হতে শুনেছিলাম। তাঁর এই গানটি আমার খুবই প্রিয়। প্রায় সময়ই এই গানটি গেয়ে থাকি"। (নির্বাচিত কবিতা/রমানাথ ভট্টাচার্য পৃঃ ২০১, মানিক দাসের নেওয়া সাক্ষাৎকার)।

তৃতীয়বার ১৯৭৯ এর ডিসেম্বরের এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল সকালে তাঁকে দেখেছি বেলুড় মঠে। দেখেছি বললে ভুল হবে—তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি বেলুড় মঠে। তখন তিনি গঙ্গাস্নান সেরে ফিরে আসছিলেন আশ্রমে। তাঁর আবাস বাড়ির গেটে, শ্যালক-শ্বশ্রুমাতা ও স্ত্রী-পুত্র সহ দেখা করি তাঁর সঙ্গে। আমার ঠাকুরদা জানকীনাথের নাম করে তাঁকে আমার পরিচয় দিই। তিনি আমাকে বিলক্ষণ চিনতে পারলেন। বললেন দীর্ঘদিন পরে এই নাম শুনলাম। তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : মিশন থেকে দীক্ষা নিয়েছ? আমার না-বোধক উত্তর শুনে বললেন—'তাহলে তোমার সঙ্গে আর কথা চলে না।" এই বলে ধীরে-ধীরে গেট অতিক্রম করে তাঁর আবাসবাড়িতে ঢুকে গেলেন। তখন আমি নবীন যুবক, তিনি বয়সের ভারে ন্যুব্জ, চোখে-মুখে ছিল না পূর্বেকার দিব্যজ্যোতি। হায়! সাধুসন্ত, সাধারণ মানুষ সবায়ই জরাদাস-জরাগ্রস্ত হন।

আমার বিশ্বাস রায়সাহেবের পুত্র জিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের ব্রহ্মচর্য তথা সন্ন্যাস অবলম্বনের প্রেক্ষিতে একটি মর্মান্তিক পারিবারিক ঘটনার যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে। আমার মা স্বর্গতা কিরণপ্রভা ভট্টাচার্য সেই ঘটনাটি বিষদভাবে আমাকে বলেছিলেন। সে অতি করুণ—অতি-অতি বেদনাদায়ক ঘটনাটি ঘটেছিল এই নিবন্ধের প্রথমাংশে বর্ণিত গোপাটটির জবরদখল নিয়ে। সে কথাই বলছি। আমাদের পাড়ার (বিদ্যাভূষর পাড়া) পূর্বাংশে ছিল দুটি পুকুর। দক্ষিণাংশের পুকুরটি ছিল রায়সাহেবের বাড়ির—উত্তরাংশের বিরাট পুকুরটি ছিল আমাদের সহ অন্যান্য শরিকের। রায়সাহেবের বাড়ির পুকুরটির বিস্তৃত উত্তরপার ও পূর্বপারের শিবমন্দির-ঘেঁষা উত্তরাংশ অতিক্রম করার পরে ছিল একটি পায়ে হাঁটা পথ। সেই পথটির ঈষৎ ছিল পূর্বমুখী, তারপর সেটি কিছুদূর পর্যন্ত ছিল উত্তরমুখী, তারপরে আবার ঈষৎ পূর্বমুখী হয়ে সেটি মিলেছিল বিশাল সরকারী পুকুরের পশ্চিম-দক্ষিণ পায়ের প্রায় মিলনস্থলে। সরকারি পুকুরটির পূর্বপারে বাস করতো কয়েক ঘর ইসলাম-ধর্মী লোক। তারা সরকারি পুকুরটির দক্ষিণ-পার ধরে আমার বর্ণিত পায়ে-হাঁটা পথটি অতিক্রম করে রায়সাহেবের বাড়ির উত্তর-পূর্ব পুকুর পার দিয়ে পাড়ার মধ্যস্থিত গোপাটটি ধরে তাদের গবাদি পশু চরাতে নিয়ে যেত পাড়াটির পশ্চিমে অবস্থিত বিস্তীর্ণ মাঠে। সরকারি পুকুরের পশ্চিম-পারের লোকজন তাঁদের বাড়ির পুকুরপার গোপাট রূপে ব্যবহার করছে দেখে রায়সাহেব গিরিজা বিশ্বাস আপত্তি জানিয়েছিলেন। তাঁর আপত্তিটা ওই সব লোকজন মেনে নিতে পারেনি। ফলে রায়সাহেব ও তাদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। তারা গোপনে রায়সাহেবকে হত্যার চক্রান্ত করে এবং সেই পাপকর্মটি সম্পন্ন করার দায়িত্ব নেয় সরকারি পুকুরের পূর্ব-পারের বাসিন্দা ছবু মিয়ার বাবা। লোকটি ছিল রায়সাহেবের অনুগত ভৃত্য তথা প্রজা।

এখন বলছি কী উপায় অবলম্বন করে রায়সাহেবকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিল ছবু মিয়ার বাবা সেই মর্মান্তিক ঘটনাটি। এক শীতের সন্ধ্যা হয়-হয় সময়ে তার চাদরের ভেতরে একহাতে লুকিয়ে রেখে একটি ধারালো দা সে উপস্থিত হল (আমাদের পাড়ার উত্তরাংশে বসবাসকারী আবু চক্রবর্তী ও যতীন্দ্র চক্রবর্তীর বাবা) দেওয়ানজীর সঙ্গে আড্ডারত রায়সাহেবরে নিকট। তাঁকে সে বলল : সাহেব, বাড়িতে লোক এসেছে, চলুন। সেই খবর পেয়ে বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা বন্ধ করে তিনি রওয়ানা দিলেন বাড়ির দিকে—তাঁর পেছনে-পেছনে ছিল ছবু মিয়ার বাবা। রায়সাহেবের বাড়ির পুকুরটির উত্তরপার যেখানে এসে মিলিত হয়েছে আমাদের পাড়ার ভেতরকার গোপাটটির সঙ্গে সেখানে পৌঁছামাত্র সে তাঁকে চাদরের ভেতরে লুকোনো ধারালো দা বের করে বত্রিশবার কোপাঘাত করল। অতি-অতি বেদনা-কাতর হয়ে তিনি চিৎকার করতে লাগলেন। তাঁর চিৎকার শুনে ঈষৎ দূরে আমাদের পুকুরে রোগী দেখে অবেলায় স্নানরত আমার ঠাকুরদা ডাক্তার জানকীনাথ তড়িৎগতিতে সেখানে লোটা হাতে উপস্থিত হলেন এবং লোটার আঘাতে সে জিঘাংসুকে তাড়িয়ে দিয়ে অগ্রজ জ্ঞাতির প্রাণ-রক্ষা করলেন। রক্তস্রোতে প্লাবিত পিতৃদেহ দেখে ক্রোধে অন্ধ পুত্র জিতেন্দ্রনাথ (ভবিষ্যতের স্বামী চণ্ডিকানন্দ) আত্মরক্ষার জন্য বাড়ির গোপন স্থানে রাখা অস্ত্রশস্ত্র থেকে একটি বর্শা হাতে তুলে নিলেন এবং অস্ত্রটি হাতে দৌড়ে চলে গেলেন পিতৃ-জিঘাংসু ছবু মিয়ার বাবার সন্ধানে আর তাকে পেয়েও গেলেন তার বসতবাড়িতে। দেখা মাত্রই তাঁকে তিনি বর্শাবিদ্ধ করলেন—অস্ত্রটির ছুঁচালো ফলা তার পেট বিদ্ধ করে পিঠ অতিক্রম করল। তখন তিনি দশম শ্রেণির ছাত্র। তাঁর বয়স ছিল ষোলো। (মতান্তরে তখন তিনি পাঠশালার ছাত্র এবং পিতাকে বধোদ্যত ছবু মিয়ার বাবাকে তিনি ছুরিকাঘাত করেছিলেন। পাঠশালায় পাঠরত একটি ছেলে সেই ভয়ঙ্কর জিঘাংসুকে ছুরিকাঘাত করতে যাবে—এ বিশ্বাসযোগ্য নয়।)

ছবু মিয়ার বাবার রায়সাহেবকে হত্যা করার চেষ্টা এবং অতি রাগান্বিত জিতেন্দ্রনাথের পাল্টা আক্রমণ গোপাটটির অধিকার নিয়ে মকদ্দমা হয়েছিল। কোর্টের রায় রায়সাহেবের অনুকূলে বেরিয়েছিল। ঘোরতর অপরাধকারী ছবু মিয়ার বাবার শাস্তি হয়েছিল চোদ্দ বছর দীপান্তর বাস, জিতেন্দ্রনাথ তখন নাবালক ছিলেন, সেকারণে তাঁর গুরুতর অপরাধের জন্য কোনো শাস্তি হয়নি। (মতান্তরে একদিনের জন্য তাঁকে কারাবাস করতে হয়েছিল।)

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জিঘাংসু কর্তক পিতা গিরিজা বিশ্বাসের সর্বাঙ্গে কোপাঘাত ও কোপাহত দেহ থেকে প্রবাহিত রক্তস্রোত দেখে তথা প্রতিশোধ নেবার জন্য পিতৃজিঘাংসুকে জিতেন্দ্রনাথের গুরুতর বর্শাঘাত—এ দুটি মর্মান্তিক ঘটনা সংসার-জীবনের প্রতি তাঁকে প্রবলভাবে বিতৃষ্ণ করে তুলেছিল। এই দুটি হৃদয়বিদারক স্মৃতি তাঁর মনে সতত অশান্তির আগুন জ্বালাত এবং তাঁকে বেদনাভারাক্রান্ত করে তুলত। সে কারণে ১৯১৮ সালে শ্রী শ্রী সারদাদেবী ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনে বেড়াতে এলে বি. এ. পাঠরত জিতেন্দ্রনাথ তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে ব্রহ্মচর্যও অবলম্বন করেন। পরবর্তীকালে যথাসময়ে রামকৃষ্ণ-ভুবনে সন্ন্যাস-অবলম্বন করেন।

তদানীন্তন ভারত সরকার রায়সাহেবকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল : তোমার ছেলে জিতেন্দ্রনাথ বি.এ. পাশ করলে তাঁকে বিচারপতির পদে নিযুক্ত করা হবে। পিতার মধুর স্বপ্ন ধুলিসাৎ করে তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হন।

সেই মর্মান্তিক ঘটনার পরে সুচিকিৎসায় রায়সাহেব ধীরে-ধীরে সুস্থ হয়ে উঠেন এবং শতবর্ষ আয়ুষ্কাল ভোগ করে মৃত্যুর কোলে চির বিশ্রাম নেন। (আমার স্পষ্ট মনে পড়ে দিদি মহামায়ার কোলে বসে তাঁর বাড়ি থেকে অদূরেই দেখতে পেয়েছিলাম তাঁর শ্মশান যাত্রার দৃশ্য)। তাঁর জীবদ্দশাতেই ছবু মিয়ার বাবার দীপান্তর-বাসের সমাপ্তি হয়। বাড়ি ফিরে এসে সে রায়সাহেবের সঙ্গে দেখা করে, চলা-ফেরার জন্য তাঁকে রূপার বাঁধানো হাতল-যুক্ত একটি লাঠি ও রাজকীয় ভোজনের জন্য একটি কচি হাঁস উপহার দেয়।

দুই

"শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের যে সমস্ত সন্ন্যাসী কণ্ঠসঙ্গীতে ও সঙ্গীত রচনায় সিদ্ধহস্ত, শ্রীমৎ স্বামী চণ্ডিকানন্দ তাঁহাদের অগ্রগণ্য।" ..."রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশের পরে"..."তাঁর আসল কর্ম শিশুজগতে বাস করিয়া মানুষ গড়া" (উৎস সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় শ্রীহট্টের অবদান, পৃঃ ১৪২ লেখক কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য)

তখন আমি শিলঙে কর্মরত ছিলাম। মনে হচ্ছে সময়টা ছিল ১৯৬৫-৬৬ সাল। সে সময়ে স্বামী চণ্ডিকানন্দের লেখা 'মানুষ হও' নামের একটি বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছিল শিলং রামকৃষ্ণমিশন থেকে। বিজ্ঞপ্তিটি চোদ্দ-পনেরোটি ক্রমিক সংখ্যায় বেরিয়েছিল—প্রতিটি ক্রমিকেই তাঁর মানুষের প্রতি আন্তরিক আবেদন ছিল প্রকৃত মানুষ হতে। এটি পড়ে মানবতাবাদী আমি অতি-অতি চমৎকৃত হয়েছিলাম এবং মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করেছিলাম একজন মানুষের প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠা কত জরুরী।

চণ্ডিকানন্দের সঙ্গীতে ঐশী ভাবনা ছাড়াও যে ভাবটি উজ্জ্বলতম রূপে ফুটে উঠেছে, সে ভাবটি হচ্ছে "উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" মানুষের আত্মিক উন্নতির দিকটি বড় চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর সঙ্গীতে। স্বদেশ ভাবনা, স্বদেশ প্রেম তাঁর গানের অন্যতম বিষয়। তাঁর অনেকানেক গান একাধারে গান ও কবিতা। গানে কাব্যগুণের এমন সুমধুর সমন্বয় রামপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ, কান্তকবি, অতুলপ্রসাদ সেন ও নজরুল ইসলাম ব্যতিরেকে আর কারো গানে তেমনে করে পরিলক্ষিত হয় না। তাঁর গান একাধারে গান ও গীতিকবিতা। যে-বিশিষ্ট সঙ্গীত রচয়িতা 'শৌর্য দাও বীর্য দাও নবীন জীবন দাও' ইত্যাকার প্রচুর গান রচনা করে বাংলা ভাষা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি সাধারণ সঙ্গীতরচয়িতা নন—ঋষি প্রতিম সঙ্গীত স্রষ্টা। এর অতিরিক্ত চণ্ডিকানন্দের সঙ্গীত বিষয়ে আমার লেখা সমীচীন মনে হয় না। স্বামী চণ্ডিকানন্দের সঙ্গীত-ভুবনের একজন প্রবাদপ্রতিম পুরুষ। সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায় চণ্ডিকানন্দের সঙ্গীত ভুবনের নানা কথা লিপিবদ্ধ করছেন। অতএব সেই বিষয়টি সম্পর্কে আত্মশ্লাঘার কারণে আমি নীরব থাকা শ্রেয় ও প্রেয় মনে করি।

এখন অন্য দু-একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করে আমি চণ্ডিকানন্দ সম্পর্কে আমার লেখাটি শেষ করছি। পারিবারিক সূত্রে সাহিত্য জীবনে আমি যার-পর নাই অনুপ্রেরণা পেয়েছি পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ, ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস ও স্বামী চণ্ডিকানন্দের মহত্তর জীবনযাপন থেকে। সে কারণে অশেষ শ্রদ্ধাবশত এই ত্রয়ীকে নিয়ে রচনা করেছি কবিতা। কিন্তু আমি যেহেতু সাধন-জগতের লোক নই, সেই কারণে চণ্ডিকানন্দকে নিয়ে কবিতা লিখতে গিয়ে উপলব্ধি করেছিলাম এ বোধহয় আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কোনওমতেই আমার মনের ভাবটা ভাষা দিতে পারছিলাম না। অসহায় আমি কী উপায় অবলম্বন করে তাঁকে নিয়ে কবিতাটি লিখেছিলাম এখন সে কথাটাই বলছি। আমার বাসভবনে এক আসনে স্থাপিত আমার গুরুদেবের ফটো, অন্য আসনে স্থাপিত রামকৃষ্ণ-শ্রীমা-স্বামী বিবেকানন্দ ও আমার স্ত্রীর গুরু আত্মস্থানন্দজীর ফটো। তাঁদের ফটো নিত্যদিন ভক্তিভরে পূজিত হয় বাসভবনটির একাংশে। আমি তো ভালো করে জানি স্বামী চণ্ডিকানন্দ শ্রীমার দীক্ষিত ছিলেন সে কারণে মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য যে সময়ে একনাগাড়ে তিন দিন আমি তাঁর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম : মা, চণ্ডিকানন্দকে নিয়ে একটি কবিতা লেখার শক্তি আমাকে দাও। আশ্চর্য! তৃতীয় দিনের প্রার্থনার শেষে চণ্ডিকানন্দের উপর কবিতাটি আমার কলম থেকে বেরিয়ে এল; সেই কবিতাটি শ্রী শ্রী সারদামণির দান বলেই আমি বিশ্বাস করি। তাঁরই কৃপায় একজন সংসারী মানুষের পক্ষে সাধকোত্তম চণ্ডিকানন্দকে নিয়ে কবিতাটি লেখা সম্ভব হয়েছিল। কবিতাটি নিচে উদ্ধৃত হল—(কবিতাটি আমার প্রকাশিতব্য অষ্টম কাব্যগ্রন্থ 'অন্য স্বর অন্য সুর'-এর অন্তর্ভুক্ত)

জানি আমি মা সারদা খুব স্নেহ করতেন চণ্ডিকা তোমায়
আর তুমি ভক্তিভরে রেখে গেছ পাদপদ্মে তাঁর,
অনবৈদ্য অসামান্য সঙ্গীত তোমার।
রামকৃষ্ণ-ভুবনে তুমি সুধন্য গায়ক,
কিন্নরনিন্দিত কণ্ঠে গেয়ে গেছ গান।
মহান সঙ্গীতকার তুমি রামকৃষ্ণ ভুবনে,
হে সন্ন্যাসী, অনুপম তোমার সঙ্গীত,
তোমার অনন্য গান সুরতালে কী যে সুমধুর,
কানের ভিতরে যেন সুরধনী-ধ্বনি।

"শৌর্য দাও বীর্য দাও"..."বীর সেনাপতি"
তোমার এসব গান অমৃতলহরি,
গীত হলে বৃষ্টি হয় দিব্য পৌরুষ,
এইসব গান শুনে মড়া ধরে সুর ধরে গান।
রামকৃষ্ণ-ভুবনে তুমি সুমধুর সঙ্গীতকার,

চণ্ডিকানন্দ স্বামী নাও-নাও আমার প্রণাম,
চণ্ডিকানন্দ স্বামী নাও-নাও আমার প্রণাম। ২৬.০৬.২০১৩

স্বামী চণ্ডিকানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমংহসদেব, শ্রী শ্রী সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভক্তিসঙ্গীত তথা নানা ধরনের সঙ্গীত রচনা করেচেন। শিশু-জগতে থেকে মানুষ গড়ার কাজটি ছাড়াও যখন যে রামকৃষ্ণ মিশনে ও মঠে চণ্ডিকানন্দ থেকেছেন। সেখানেই ভক্তিমূলক বা আত্মিক উন্নতির জন্য নানা ধরনের গান বাজনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। লোকজনকে রামকৃষ্ণ-শ্রীমা-বিবেকানন্দের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য এই সব গান শেখাতেন। শিলং রামকৃষ্ণ মিশনে থাকাকালীনও তিনি মিশনের ভাবধারায় উজ্জীবিত করার জন্য স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে গান শেখাতেন। তাঁর মহিলা ভক্ত ছিল প্রচুর। শোনা যায় তাঁর অনেক মহিলা ভক্ত থাকায় স্বামী সৌম্যানন্দ যখন শিলং রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারি ছিলেন সে সময়ে কোনো কোনো মহরাজ তাঁর বিরুদ্ধে কামিনী-সংস্রবের অভিযোগ অনেন। সেই অভিযোগ শুনে নিদারুণ মর্মাহত চণ্ডিকানন্দ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন ত্যাগ করার। পরিস্থিতি বিবেচনায় বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটিতে হস্তক্ষেপ করে তাঁকে ওখানে (বেলুড় মঠে) নিয়ে যান এবং সেখান থেকে তাঁকে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের শিশুমহলে বাস করে মানুষ গড়ার কাজে ও গানের মধ্য দিয়ে মিশনের ভাবধারা প্রচারের জন্য পুনর্নিয়োগ করা হয়। বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষ বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনেন (বেলুড়মঠে) বৃদ্ধ সন্ন্যাসীদের আশ্রমবাসে বিশ্রামের জন্য। সেখানেই আশি বর্ষাধিক বয়সে তিনি দেহরক্ষা করেন।

১৯.০৮.২০১৪

ব্যক্তি পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ সম্পর্কে দু'চার কথা

প্রধানত আমাদের বংশের বা বৃহত্তর পরিবারের ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে ব্যক্তি পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ সম্পর্কে যেসব কথা আমি জানতে পেরেছি সেই বিবরণই আমি লিপিবদ্ধ করছি এই নিবন্ধে।

১৯৩৮ সালে পদ্মনাথ ইহলোক ত্যাগ করলে তাঁর পুত্র ডাঃ পুণ্ডরীকাক্ষ ভট্টাচার্য ও বিরুপক্ষ ভট্টাচার্য দানসাগর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করে তাঁর পারলৌকিক কর্ম সম্পন্ন করেছিলেন। বেল কাঠ খোদাই করে তাঁর প্রতিমূর্তি নির্মিত হয়েছিল। বানিয়চঙ গ্রামের সমস্ত লোকজন তাঁর শ্রাদ্ধ-বাসরে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। লুচি, চানার ডাল, বেগুন ভাজা, আলুর দম ও দই মিষ্টি পরিবেশন করে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আপ্যায়ন করা হয়েছিল। শ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্রীহট্ট জিলার বিশিষ্ট পণ্ডিত সম্মেলন হয়েছিল।

বারবেলাতে বাইরে থেকে আগত কোনো ব্যক্তিকে পদ্মনাথ বাড়িতে ঢুকতে দিতেন না। প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে শানিপুজো হত। পূজা শেষে পুরোহিত কাঁসি ঘণ্টা বাজালে পাড়ার লোকজন এসে সমবেত হতো ও প্রসাদ পেত। শনিপূজা বলে তিনি কাউকে নিমন্ত্রণ করতেন না।

পাড়া বেড়ানো তাঁর স্বভাব ছিল। সেকালে কোনো-কোনো বাড়িতে একটি মাটির পাত্রে তুষ জ্বালিয়ে অগ্নিরক্ষণ করা হতো এবং আম কাঁঠালের দিনে নিবু-নিবু আগুনে সেই পাত্রটিতে তাঁর কোনো কোনো বউদি কাঁঠাল বিচি পুড়ে নিজেরা খেতেন—বাচ্চাদেরও খেতে দিতেন। নিবু-নিবু আগুনে কাঁঠাল-বিচি পুড়ানোর দৃশ্য দেখে পদ্মনাথ ওইসব বউদিদের উদ্দেশ্যে ঠাট্টা করে বলতেন: কি বা আগুনের আগুন তার মাঝে আবার কাঁঠাল বিচি ভাজা।

পদ্মনাথ স্বল্প-ভাষী ছিলেন। কথ্যভাষায় কথা বলতেন। কথা বলতে তোতলাতেন।

তাঁর বাসভবনে পদ্মনাথ চতুষ্পাঠী খুলেছিলেন। চতুষ্পাঠীতে বানিয়াচঙের বাইরের লোকজনও পড়াশোনা করত। চতুষ্পাঠীর প্রধান পণ্ডিতের উপাধি ছিল সাংখ্যতীর্থ।

পদ্মনাথ গোড়া ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাড়িতে তিনি মেয়েদের স্যান্ডেল পরা পছন্দ করতেন না। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র পুণ্ডরীকাক্ষ দুর্গাপুজা উপলক্ষে স্ত্রীসহ বাড়িতে এসে ঢুকেছেন সে মুহূর্তেই তিনি ভেতর-বাড়ি থেকে বলে উঠলেন: বউকে বলো স্যান্ডেল ছেড়ে বাড়িতে ঢুকতে।

মনময়ন সিং জিলার যশোদলে ছিল আমাদের কুলোগুরুর বাড়ি। পদ্মনাথের সময়ের কুলগুরু তাঁর জিনিসপত্র সহ বাড়িতে এসে ঢুকছেন দেখে তিনি রাগতস্বরে বললেন:

আপনি আসার আগে খবর দেবেন, লোক পাঠানো হবে আপনার দ্রব্যাদি বয়ে আনার জন্য। কুলগুরু নিজে তাঁর বস্তুপাতি বয়ে আনবেন পদ্মনাথ এটা পছন্দ করতেন না। কুলগুরুর প্রতি ছিল তাঁর অশেষ সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাবোধ।

পদ্মনাথ পূতপবিত্র মনে দেবার্চনা করার পক্ষপাতি ছিলেন। তাঁর এক জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র দক্ষিণরঞ্জন ভট্টাচার্য তাঁর গুয়াহাটি বাসস্থানে থেকে পড়াশুনা করতেন। পদ্মনাথের নির্দেশমতো ভোর চারটায় স্নান করে তাঁকে ফুল তুলতে হতো পূজার জন্য।

পদ্মনাথ খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সংযমী ছিলেন না। তাঁর মৃত্যুর আগে বানিয়াচঙে মহামারির আকারে কলেরা রোগ দেখা দিয়েছে। সেই ভয়ঙ্কর পরিবেশের মধ্যেই তাঁর পাচকের রান্না করা মুগ ডালের সঙ্গে কুড়ি পঁচিশটা পোস্তর বড়া খেয়েছিলেন। পরিনামে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে ইহলীলা ত্যাগ করেন।

পদ্মনাথ দুর্গাপুজা পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন: দণ্ডবীন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরা সংস্কৃতে রচিত পূজার মন্ত্র শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারেন না। তাঁর মত ছিল শাস্ত্রসম্মতভাবে দেবীর পূজা সম্পন্ন না হলে তাঁর কোপানলে পড়ে পূজার উদ্যোক্তা নির্বংশ হতে পারে। দন্তহীন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরা শুদ্ধভাবে সংস্কৃত উচ্চারণ করতে পারে না বলে যে কোনো পূজাই তাঁদের দ্বারা করানো ঠিক নয় বলে পদ্মনাথ মনে করতেন।

পদ্মনাথ এমনিতে খুব স্নেহশীল ছিলেন। কিন্তু স্ত্রী পুত্র নিয়ে অতি ব্যস্ত লোকজন তিনি অপছন্দ করতেন। ছেলেমেয়েকে কোলে কাঁধে করে পাড়া বেড়ানো তাঁর ভালো লাগত না। তিনি স্নেহমমতা সংক্রান্ত ব্যাপারে সংযমশাসিত লোকজন ভালোবাসতেন।

পদ্মনাথ পূতপবিত্র জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। বাড়ির বাইরে গ্রামে কোথাও বেড়াতে গেলে তিনি বাড়ি ফিরে পরিহিত বস্ত্র পরিবর্তন করতেন।

তাঁর বাড়িতে একবার কুমারী পূজা হয়েছিল। ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি নাতনি রানিকে কুমারী নির্বাচন করে তিনি পূজা করেছিলেন।

স্ত্রী বিয়োগের পর ১৯৩৫ সালে কাশী থেকে প্রত্যাগত পদ্মনাথ যখন শরিকি বাড়িতে গৃহনির্মাণ করেছিলেন সে সময়ে তিনি তাঁর অংশের সীমাসংক্রান্ত ব্যাপারে ঘনিষ্ঠ দু'জন জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে শরিকি মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। কোর্টের রায় পদ্মনাথেরই অনুকূলে বেরিয়েছিল।

তাঁর পুত্র বিরুপাক্ষ ও তাঁর জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র রজনীনাথ আমার জ্যাঠামহাশয় ঢাকায় ডাক্তারি পড়তে গেলেন। কিন্তু সেখানে তাঁরা দু'জনই প্রায়শ বাইজি-নাচ দেখতেন। তাঁদের গতিবিধি প্রত্যক্ষ করার জন্য তিনি ঢাকায় গেলেন। সেখানে যাবার পরে তিনি সচক্ষেই দেখতে পেলেন ছেলে ও ভাইপো মিলে বাইজি-নাচ দেখছেন। তাদের অধঃপতনের দৃশ্য দেখে তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁদের বাড়িতে ফিরিয়ে আনেন।

গ্রামের মার্কসবাদী যুবকেরা তাঁকে পছন্দ করত না। তিনি পূজা-আহ্নিক নিয়ে থাকতেন সেজন্য তারা তাকে অপছন্দ করত।

দ্বিতীয় পুত্র বিরুপাক্ষ কলকাতায় হোস্টেলে থেকে আই.এ পড়ছিলেন। একদিন তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য তাঁর হোস্টেলে উপস্থিত হলেন পদ্মনাথ। সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন পুত্রের বসবাস করার রুমটি হারমোনিয়াম, তবলা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রে সাজানো। বিচক্ষণ পদ্মনাথ বুঝতে পারলেন পুত্র লেখাপড়ার চেয়ে গান-বাজনারই বেশি অনুরক্ত। তৎক্ষণাৎ তাঁর পড়াশোনা বন্ধ করে দেন তিনি।

পদ্মনাথ অতি শুচিবায়ুগ্রস্ত লোক ছিলেন। তিনি কাশী থাকাকালীন তাঁর ছেলেরা বা মেয়ের জামাইরা তাঁর বাসস্থানে বেড়াতে গেলে ধোপা ময়লা জামা-কাপড় ধুয়ে ইস্ত্রি করে বাড়িতে দিয়ে গেলে ঘুণাক্ষরে তিনি জানতে পারলে সেই সব জামা কাপড় চৌবাচ্চার জলে আবার ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হতো।

স্ত্রীর হাতে ভাতের হাঁড়ি পাতিল ভেঙে গেলে ফ্যান ঝরাতে গিয়ে তিনি বকাবকি শুরু করলে পদ্মনাথ গিন্নিকে ধমক দিতেন।

কবিশেখর কালিদাস রায় বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের প্রতিনিধি রূপে একবার গুয়াহাটি এলে পদ্মনাথের বাসভবনে রাত্রিবাস করেছিলেন। এবং রাতভর দু'জনে সাহিত্য বিষয়ে আলোচনায় মগ্ন ছিলেন। বিদায় নেওয়ার সময়ে কবিশেখর তাঁকে বলেছিলেন: আপনার কাছ থেকে অনেক জ্ঞান লাভ করলাম আপনাকে আমার প্রণাম।

আমি একদিন কবি নীলমণি ফুকনের বাড়িতে গেলে গল্পচ্ছলে তিনি আমাকে বলেছিলেন পদ্মনাথের গুয়াহাটি বাসায় সাহেবেরা এলে তিনি নিজ হাতে জগে চা ঢেলে দিতেন— এভাবেই তিনি তাঁদের চা খেতে দিতেন। অন্য একদিন বিকেল বেলা মালিগাঁও থেকে বাসে পাশাপাশি বসে আমি ও নীলমণি ফুকন যাচ্ছি উজান বাজারের দিকে; বাস শুক্লেশ্বর মন্দিরের সম্মুখে এলেই তিনি আমাকে বললেন: রাস্তার ওপাশে তাঁর সময়ের কোনো বাড়িতে পদ্মনাথ থাকতেন।

কথিত আছে রাস্তাঘাটে চলাফেরার সময়ে তাঁর দৈহিক শুদ্ধতা রক্ষার জন্য পদ্মনাথ শুষ্ক গোময় প্যাকেট বন্দি করে তাঁর পাঞ্জাবির পকেটে রাখতেন।

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে যেসব তথ্য আমি জ্ঞাত হয়েছি, কবি নীলমণি ফুকন বাদে, সেসব কথা আমি জেনেছি স্বর্গত পিতৃদেব রমণীমোহন ভট্টাচার্য, স্বর্গত অগ্রজ জ্ঞাতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, কলকাতাবাসী অগ্রজ জ্ঞাতি শক্তিপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও শিলচর নিবাসী অগ্রজ জ্ঞাতি দেবজ্যোতি ভট্টাচার্যের কাছ থেকে। অগ্রজজনকে এসব তথ্য পরিবেশনের জন্য অবনত শিরে অশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

৩১.০৮.২০১৪

কাব্যে আধুনিকতা

বহুবিধ উপাদানের সমাহারে শিল্প-সাহিত্যে সঞ্চারিত হয় আধুনিকতা। আধুনিকতা আসলে স্বকাল ও চিরকালের মধ্যে সেতুবন্ধন— নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও সৃষ্টিভঙ্গির মেলবন্ধন। শিল্পে-সাহিত্যে আধুনিকতা মানে নবতর সুরের সাধনা। যে কোনো সত্তম শিল্পকর্ম বা সাহিত্যকর্মে এসব গুণাবলিরই সহ অবস্থান।

অজন্তা-ইলোরার গুহাচিত্রে, এলিফেন্টা, কোনারক বা খাজুরাহের শিল্প কর্মে, বিশ্বের বিস্ময় তাজমহলের স্থাপত্যকর্মে শিল্পীরা করেছেন চির সুন্দরেরই রূপাঙ্কন। সে কারণেই এসব শিল্পকর্ম দেখে সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী রসিকজন হন আনন্দবিহ্বল। সাহিত্য-সঙ্গীতে স্বকাল ও চিরকালের আনাগোনা দেখে— দৃষ্টিভঙ্গি ও সৃষ্টি-ভঙ্গির নতুনত্ব দেখে রসজ্ঞজন হন পুলক চঞ্চল। এ কারণেই রামায়ণ-মহাভারত, ইলিয়াড ও ওডিসি, ডিভাইন কমেডি, বেদ-উপনিষদ, কালিদাস, বাণভট্ট, বররুচি, শ্রীহর্ষ, ভর্তৃহরি, জয়দেব প্রমুখের কাব্য পড়ে রসিককুল হন পুলকিত।

দীর্ঘদিন ধরে আমি কবিতার একজন পাঠক। সে কারণে কবিতা নিয়েই করছি আলোচনা। গভীর জীবনবোধ ও অভিনব রচনাশৈলীর গুণেই কবিতার অন্তরঙ্গে-বহিরঙ্গে জ্বলে ওঠে দ্বীপশিখা— কবিতা হয়ে ওঠে ভাস্বর। স্বদেশি-বিদেশী প্রচুর সত্তম কবিতা পড়ে মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করেছি কবিতার ক্ষেত্রে এ দু'টি উপাদানই রচনাকে করে তোলে মহোত্তম। অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি ও সৃষ্টিভঙ্গির জন্যই ওমরখৈয়াম ও হাফিজ, রুমি ও গালিব, শেলি-কীটস ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ, র‍্যাব-বদলেয়ার, গ্যাটে হ্যেল্ডার্লিন ও রিলকে, এলিয়ট ও মনতালে, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ দাশ এবং অন্যান্য অনেক কবি হয়ে উঠেছেন কবির কবি।

বিশ্বের সমূহ মহোত্তম কবির রচনার মুখ্য বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তাঁদের কবিতায় উঠে আসে জীবনের বিচিত্র দিক— রংবেরঙের জীবনকথা। সর্বোপরি অভিনব রচনারীতি ও গভীরতম জীবনবোধের সমন্বয়ে তাঁদের কবিতায় উঠে আসে শত শত স্মরণীয় পঙ্‌ক্তি— শত শত অবিস্মরণীয় উক্তি। ছন্দমাধুর্য ও সঙ্গীতময়তাও তাঁদের কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সঙ্গীতময়তা কবিতাকে দেয় প্রতিশীলতা— রচনাকে করে প্রাণবন্ত। এখানেই সব সাধারণ কবির সঙ্গে সমূহ মহোত্তম কবির মৌলিক পার্থক্য। সাধারণ কবি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি তথা রচনারীতির অভাবে জীবনভর রচনা করেন প্রধানত পদ্য— তাঁদের রচনায় সাধারণত প্রতিফলিত হয় শুধু শুধু স্বকালের সমস্যা, স্বকালের সংবাদ, স্বকাল চেতনায় উদ্বুদ্ধ কিছু পদ্য— মহোত্তম কবিদের মতো মহাজীবনের হাতছানি নেই তাঁদের কবিতায়— স্মরণীয় পঙ্‌ক্তির বড় অভাব তাঁদের রচনায়। সে কারণে, সাধারণ কবির রচনা পড়ে থাকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে।

বিশ্বসাহিত্যে অন্য এক শ্রেণির কবি আছেন তাঁরা হচ্ছেন অনন্যসাধারণ বা অসাধারণ কবি। বাংলা ভাষার অসাধারণ কবিকুল হচ্ছেন বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, জ্ঞান দাস, রায় শেখর, গোবিন্দ দাস, মুকুন্দ চক্রবর্তী, রায়গুণাকার ভারতচন্দ্র, বিহারীলাল চক্রবর্তী, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবতী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, জয় গোস্বামী প্রমুখ। তাঁদেরও রচনারীতি তথা দৃষ্টিভঙ্গি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল, স্বকাল ও চিরকালের পদধ্বনি বহুশ্রুত তাঁদেরও রচনায়, তাঁদেরও রচনা ছন্দমাধুর্য বা সঙ্গীতময়তায় অনবদ্য। তাঁরাও মহোত্তম কবিদের মতো বার-বার পরিবর্তন করেন তাঁদের রচনাভঙ্গি। তবে মহোত্তম কবিদের মতো তাঁদের রচনায় বিস্তার ও গভীরতা লক্ষিত হয় না— তাঁদের রচনাশৈলী ও দৃষ্টিভঙ্গিও নয় মহোত্তম কবিদের সমতুল্য— এক কথায় মহোত্তম কবিরা সকলেই কবিচূড়ামণি আর তাঁরা অসাধারণ বা অনন্যসাধারণ কবি।

আমি বাংলা ভাষায় রচিত বৈষ্ণব পদাবলির রসাস্বাদন করি সতত। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মোড়কে বৈষ্ণব কবিরা লিখেছেন যে প্রেমকাব্য তা চিরকালীন নরনারীরই প্রেমকথা— সর্বকালের মানবমানবীরই মিলন বিরহ গাঁথা অর্থাৎ প্রেমের আধারে রচিত তাঁদের কবিতা কোনো বিশেষ কালবন্দি রচনা নয়— চিরকালের মানব-মানবীর অনবদ্য প্রেমকথা। প্রেমক্ষেত্রে বৈষ্ণব সাহিত্যে ধৃত এই চিরকালীনতাই তার আধুনিকতা। তাঁদের রচিত প্রেমের কবিতা যাতে সর্বকালের রসিকজন সানন্দে গ্রহণ করেন সেজন্য তাঁরা ছিলেন তৎপর। তাঁদের রচিত পদাবলি তাই ছন্দমাধুর্য্যে— সঙ্গীতময়তায়, রচনা নৈপুণ্যে ও দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবত্বে অনুপম-অম্লান-অজর-অমর।

এক সময়ে আমি প্রচুর প্রাচীন চিনা কবিতা ও জাপানী কবিতা, উর্দু কবিতা এবং আধুনিক অসমিয়া কবিতা পড়েছি। এই সব কবিতা পড়ে আমি সম্যক বুঝতে পেরেছি ভালো কবিতা বা মহৎ কবিতা চির ভাস্বর— চির অম্লান। প্রতিটি সাহিত্য অধ্যায়ন কালে লক্ষ্য করেছি অভিনব দৃষ্টিকোণ থেকে কবিরা দেখছেন জীবন ও জগৎ— নব নব রচনারীতিতে কবিরা লিখছেন কবিতা— তাঁদের লেখা প্রতিটি কবিতা হয়ে উঠেছে কালোত্তীর্ণ রচনা— শুধু স্বকাল নয়— চিরকালের হাতছানি পরিদৃশ্য তাঁদের কবিতায় অর্থাৎ অনুভবের দিক থেকে তাঁদের রচিত প্রতিটি কবিতা স্বকাল ও চিরকালেরই মানব মানবীরই আত্মকথা। এই কাঞ্চন উজ্জ্বল দিকটাই সাহিত্য-শিল্পে আধুনিকতা।

কবিতা রচনায় কল্পনারও রয়েছে বিরাট ভূমিকা। কল্পনা ব্যতিরেক কোনো মহোত্তম কবি বা অসাধারণ কবির অনুভবই বাণীরূপ পায় না— হয়ে ওঠে না বাঙময়। কবিতায় যে প্রতীক-চিত্রকল্প-রূপকল্প ও উপমার উৎসব পরিলক্ষিত হয় তা তো কবি মণীষাকে কল্পনারই দান। স্বতোস্ফূর্তভাবেই এসব উপাদান উঠে আসে সত্তম কবিতায়। স্বভাবোক্তি— অতিশয়োক্তি ইত্যাকার বহুবিধ অলঙ্কারও স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসে উৎকৃষ্ট কবিতায়। অনুভব তাড়িত হয়ে কল্পনার সহযোগেই এসব উপাদান আহরণ করেন মহোত্তম কবি বা

অসাধারণ কবি। আর এসব উপাদান যোগেই কবিতা হয়ে ওঠে চিরকালের জন্য আধুনিক— অর্থাৎ বহুবিধ উপাদানের সমাহারেই কবিতা হয়ে ওঠে আধুনিক— হয়ে ওঠে চিরকালীন; এভাবেই যুগে যুগে কবিতায় উঠে আসে আধুনিকতা।

মহোত্তম কবিকুল বা অনন্য সাধারণ কবিরা কল্পনা-মনীষার সহায়তায় তাঁদের অনুভব গদ্যছন্দেও প্রকাশ করেন। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তথা নতুন রচনারীতিতে গদ্যছন্দে তাঁরা লেখেন উৎকৃষ্ট কবিতা। তাঁদের রচিত গদ্য কবিতায়ও স্বকাল-চিরকালের নিত্য আনাগোনা। বাংলা সাহিত্যে গদ্য কবিতা তার উজ্জ্বল উদাহরণ— অন্যান্য বহু ভাষায় রচিত সাহিত্যও প্রচুর গদ্য কবিতার ঋদ্ধ।

১৮.০৯.২০১৪

মুম্বাইস্থিত মৈত্রী কালচারেল এসোসিয়েশনের প্রথম দুর্গোৎসব ২০১৪

মন ভালো আজ

মন ভালো আজ হৃদয়জুড়ে পূজার হাওয়া
চোখ খুললেই সপরিবারে দশভুজা
শ্যামা-সঙ্গীত শুনে-শুনে মন ভালো আজ
মন ভালো আজ দেখে-দেখে দশভূজা
মন ভালো আজ হৃদয় জুড়ে আলোর হওয়া
মন ভালো আজ হৃদয় জুড়ে খুশির হাওয়া
সবখানে আজ মধুর-মধুর মধুর হাওয়া।
সবখানে আজ মধুর-মধুর মধুর হাওয়া। ২৪. ৯. ২০১৪

২০১৩-এর শারদোৎসবের পরে মালাডবাসী বঙ্গসংস্কৃতি অনুরাগী কয়েকজন কমবয়সী-মধ্যবয়সী ও প্রৌঢ় বাঙালি ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার অতি অতি আন্তরিক উদ্যোগেই জন্ম নেয় মৈত্রী কালচারেল অ্যাসোসিয়েশন। তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য হল সরস্বতী পূজা, শক্তির দেবী দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা ও দেওয়ালির শুভলগ্নে শ্যামাপূজার মাধ্যমে সর্বভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে মহামিলনের সেতুবন্ধ রচনা করা। দীর্ঘদিন রাত্রিদিন পরিশ্রম করে ওই শুভকর্মে তথা মিলন উৎসবে তাঁরা সম্পূর্ণ সফলতা অর্জন করেছেন। পাম কোর্টস্থিত ক্লাব ঘরে ২০১৪-এর বাণী বন্দনার মাধ্যমেই এই মিলন উৎসবের সূচনা হয়।

মৈত্রী কালচারালেল অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম বছরের এই শারদোৎসব বিভিন্ন দিক থেকেই অশেষ সুষমামণ্ডিত হয়ে উঠেছে— হয়ে উঠেছে বিশেষ আকর্ষণীয়। গোরেগাঁও স্পোর্টস ক্লাবের উল্টো দিকে স্বগৎপার্কের বিরাট ময়দানে বিশাল প্যান্ডেলে বেঁধে, নাচগান ইত্যাদি পরিবেশনের জন্য বিস্তৃত মঞ্চ প্রস্তুত করে, ভক্তজন বসার জন্য মঞ্চের সামনে সারি বন্দি অসংখ্য চেয়ার পেতে— সপরিবারে জগৎমাতা মহামায়ার জন্য অপরূপ সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে এই শারদোৎসবের করা হয়েছে আয়োজন। শ্বেতশুভ্র মন্দিরে সবাহন বসানো হয় সোনালি মুখ ও সুচারু নেত্রযুক্ত তুষার ধবল দুর্গাপ্রতিমা, লক্ষ্মী সরস্বতী তথা কার্ত্তিক গণেশের নয়ন হরণ মূর্তি। সপরিবারে দুর্গাদেবীর এই অপরূপ রূপ দর্শন করে ভক্তজন হয়েছেন বিমোহিত। পূজার দিনগুলিতে নববস্ত্র পরিহিত সংখ্যাহীন ভক্তজনের

উপস্থিতি ছিল পূজা মণ্ডপে। আবাল বৃদ্ধ বনিতার মনপ্রাণে বইছিল আনন্দের বন্যা। অঞ্জলির অন্তে নানা ধরনের মুখরোচক প্রসাদ পেয়ে ভক্তেরা করেছেন ভুরিভোজ। পুজার রাতগুলি ভক্তজনের কাছে আনন্দমুখর হয়ে উঠেছিল নানা সম্প্রদায়সহ নারায়ণ অধিকারীর চিত্তাকর্ষক বাউল গান শুনে, গানবাজনা-মুখর স্টেজে শুভ্র উজ্জ্বল ক্যানভাসে সুবোধ পোদ্দারের অপূর্ব চিত্র আঁকা দেখে, বাংলার আশ্চর্য সুন্দর ছৌ নাচের মাধ্যমে মহিসাসুর মর্দিনী দেখে বহু পুরুষ মহিলার বিচিত্র ধরনের নাচ দেখে, তাঁদের পরিবেশিত গান শুনে, নাটক দেখে। মুখ্যত যাঁদের আন্তরিক উদ্যোগে এই আনন্দ-উৎসব সম্পূর্ণ সাফল্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাঁরা হলেন শ্রীমতী রূপা রয়, ঋতা দত্ত, রূপা বৈদ্য, সোমা ঘোষ, বিশাখা চ্যাটার্জী এবং শ্রী গোবিন্দ বৈদ্য, সুপ্রিয় দত্ত, জয়ন্ত চ্যাটার্জি, তনুজ রায়, অরুণাংশু ঘোষ, রবি আগরওয়াল, সুবোধ পোদ্দার, দেবপ্রসাদ মজুমদার অরিন্দম রায় ও শ্যামাশিস ভট্টাচার্য।

জগৎজননী শ্রীশ্রীদুর্গার কাছে আমার অশেষ প্রার্থনা মৈত্রী কালচারেল অ্যাসোসিয়েশনের এই আনন্দ উৎসব শতায়ু হয়ে মিলন তীর্থের রূপ ধারণ করুক।